বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

একত্রিংশ খণ্ড | গ্রীষ্ম সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

সম্পাদক
নূরুর রহমান খান

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ কুমার রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক নূরুর রহমান খান
সদস্য	:	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
		অধ্যাপক মাহফুজা খানম
		অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
		অধ্যাপক হাবিবা খাতুন
		অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal) edited by Professor Nurur Rahman Khan, published by the General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9576391

Price : Tk. 200.00
US$ 10.00

সূচিপত্র

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকসংস্কৃতি: প্রসঙ্গ বিবাহ
শামীমা সুলতানা ১

সুন্দরবনের লোকজীবন ও সমাজ পরিচিতি
প্রণব কুমার রায় ৩৫

বৈদিক মন্ত্রসাহিত্যে বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ
শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ ৬৩

ভারত বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
আনন্দ বিকাশ চাকমা ৭৩

প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি ভারতের শাসক দলের নীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
মোহাম্মদ নাজমুল হুদা ৯৭

কাবিননামায় দাম্পত্যচিত্র
বিলকিস রহমান ১২১

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা
আনিসুজ্জামান ১৫১

লেখকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখক-কে/-দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ১) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানদের নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবি ব্যবহার করা হবে।

৭. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। বিদেশী শব্দ বাংলা বর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপনরীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

১০. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ বিবাহ

শামীমা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলকাব্য বিশ্লেষণ করলে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির একটি রূপরেখা অনায়াসে পেতে পারি। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে যেহেতু প্রধান প্রবণতা ধর্মকেন্দ্রিকতা, সেহেতু প্রতিফলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে অলৌকিকতা, অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস, তুকতাক, মন্ত্র, জাদুটোনা প্রভৃতি জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান মঙ্গলকাব্য– চণ্ডীমঙ্গল, যেখানে উঠে এসেছে ব্যাধ-সমাজের জীবিকার সংগ্রাম, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সহাবস্থানসহ সংস্কৃতির নানা দিকের চিত্র, যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে বিবাহ-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। ঘটক নিয়োগ, বিবাহে পণ, পাকা-কথা ও লগ্নপত্র, বিবাহে দিনক্ষণ স্থিরকরণ এবং জ্যোতিষী বা গণকের ভূমিকা, বিবাহে নিমন্ত্রণ, অধিবাস, গায়ে হলুদ, মঙ্গল-স্নান, মঙ্গল গীত বা গান, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, জলসহা বা জলভরা, বরের সাজ-পোশাক, কনে সাজ, বর শোভাযাত্রা ও বরযাত্রী, বিবাহে বাদ্য-বাজনা, বরবরণ বা জামাতা বরণ, সাতপাক, কন্যাসম্প্রদান বা কন্যাদান, বাসরঘর বা ফুলশয্যা, বধূবরণ বা বৌ পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা চণ্ডীমঙ্গলকাব্য থেকে পাই। এর মধ্য দিয়ে আমরা উক্ত সময়ের মানুষের জীবনাচরণ অনুধাবন করতে পারি। সমাজজীবনে প্রতিফলিত লোকাচারের ব্যাপক পরিচয়ও এ প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলো লোকসংস্কৃতির উপাদানে ভরপুর। বাঙালির লোকায়ত জীবন এ সাহিত্যধারায় যতটা অন্তরঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা মধ্যযুগের অন্য কোনো আঙ্গিকে লক্ষ করা যায় না। বাঙালির জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-অনুষ্ঠান এবং তার নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কার মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরে অনবদ্য রূপ পেয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছে বাংলা লোকসংস্কৃতির আকর।

প্রধান প্রধান বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় উদ্ভাসন লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলকাব্য বিশ্লেষণ করলে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির একটি রূপরেখা পেতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলকাব্য বাঙালি সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন আবহ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্প-অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকজ বিশ্বাস

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ও বণিক সমাজের সংস্কারগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ-সমাজের জীবিকার সংগ্রাম, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের চিত্র উঠে এসেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সংগ্রামশীল ও বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা অভিব্যক্ত হয়েছে। আর অন্নদামঙ্গল কাব্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অন্নের আকাঙ্ক্ষা তথা জীবন-সংগ্রাম ও বাঙালির বিবিধ জীবনাচার অনবদ্য ভাষায় রূপায়িত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রবণতা ধর্মকেন্দ্রিকতা। ফলে মঙ্গলকাব্যে জনজীবন ও লোকায়ত সমাজের যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে তাতে অলৌকিকতা, অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস, তুকতাক, মন্ত্র, জাদুটোনা প্রভৃতি জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। ধর্ম ও সংস্কৃতির এই পারস্পরিকতা সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ধর্ম্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোকের ধর্ম্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে।"[১]

মঙ্গলকাব্যের একটি বড় অংশ দখল করে আছে অশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষ। তাই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য ধর্মকেই তারা অবলম্বন করেছিল। তাদের সংস্কৃতি-চিন্তাও এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণের জন্যও মানুষকে তাই অদৃশ্য শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়।

এ ছাড়া এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যের সাংস্কৃতিক আবহে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা নদীবহুল অঞ্চল। বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতিতেও নদীর প্রভাব প্রবল। আর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

বাংলায় বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষের সহাবস্থান ছিল। ফলে এখানে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাও বিকাশ লাভ করেছে, যা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করেছে। মঙ্গলকাব্যেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলো গড়ে উঠেছে মূলত সমসাময়িক সমাজ ও অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী সময়ের লোকজীবনকে আশ্রয় করে। তবে প্রাক্-আর্য যুগ থেকে প্রবহমান লোকসংস্কৃতির উপাদানও যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল তা মঙ্গলকাব্যগুলোতে লক্ষ করা যায়। আর্যদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মঙ্গলকাব্যগুলোতে গভীর ছায়া ফেলেছে।

মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে রূপায়িত হয়েছে সাধারণ মানুষের বিচিত্র ও বর্ণিল জীবনযাত্রা। এখানে সাধারণ মানুষ জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত। দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য

তাদেরকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃতির দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর তাদের জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। প্রকৃতি বিরূপ হলে তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হত। তাই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করে তারা পূজার মাধ্যমে তাদেরকে তুষ্ট করে বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রকে নির্ঝঞ্ঝাট করতে চেয়েছে। এরই ফলে অন্নের বরদাত্রী অন্নদা, সর্পদেবী মনসা, অসুর-নাশিনী চণ্ডী, কিংবা ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। একইভাবে বাস্তবজীবনে বিভিন্ন অকল্যাণের আশঙ্কা থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তৎকালীন সমাজে মানুষ যে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান, কৃত্য, উৎসব প্রভৃতি পালন করত তা বিধৃত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলোতে। মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে তাই বাঙালির লোকসংস্কৃতির প্রবণতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধে বিবাহ-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হবে।

বিবাহ-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিবাহ। বিবাহের মধ্য দিয়ে দুটি নির্দিষ্ট নর-নারী দাম্পত্যজীবন যাপনের অধিকার পায়। বিবাহের ইতিহাস মানুষের চিন্তার প্রাগ্রসরতা সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বিবাহের মধ্য দিয়ে মানুষ পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে এবং সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে তার উত্তরাধিকারকে নিশ্চিত করে।

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বিবাহের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। বীল্‌স্ এবং হয়জারের মতে,

> বিবাহ একটি জটিল সাংস্কৃতিক ঘটনা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন, ঘরবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামাজিক দায়দায়িত্বও পালন করা হয়।[২]

নৃবিজ্ঞানের *নোট্‌স এন্ড কোয়ারিজ* গ্রন্থে বিবাহের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হল, "একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মিলনে যে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, সমাজ বা আইন যখন তাদের এই দম্পতির সন্তান বলে গণ্য করে তখন তাকে বিবাহ বলে।"[৩]

বিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্কের বিবাহ সম্পর্কিত সংজ্ঞা বহুল প্রচলিত এবং স্বীকৃত। তাঁর মতে,

> সমাজ বা আইন দ্বারা স্বীকৃত এক বা একাধিক স্ত্রী ও এক বা একাধিক পুরুষের মিলনকে বিবাহ বলে। এই মিলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবার গড়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের উভয় পক্ষের কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে।"[৪]

এই কর্তব্য ও দায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যেমন নিরাপত্তা দেয় তেমনি সামাজিক বন্ধনকে করে দৃঢ়। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে আমরা বিবাহের বিদ্যায়তনিক পাঠ পেয়ে থাকি।

বাঙালির বিবাহ উপলক্ষে যে-সব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় তার অধিকাংশই বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য। এর সঙ্গে বহুপূর্বের বিশেষভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বলপূর্বক কন্যাকে তুলে আনার স্মৃতি জড়িত বলেও কেউ কেউ মনে করেন। নৃবিজ্ঞানের

ভাষায় এ ধরনের বিবাহ 'Marriage by Capture' নামে অভিহিত। প্রাচীন ভারতে এর নাম ছিল 'রাক্ষস বিবাহ'। এই বিবাহের সঙ্গে কন্যা অপহরণের বিষয়টি জড়িত। অন্য পরিবার বা গোত্র থেকে জোরপূর্বক কন্যা অপরহণ করে স্বগৃহে আনতে পারলে তার ওপর স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত।

> বাঙালী বিবাহ আচারসর্বস্ব। অধিকাংশ আচারই অশুভ শক্তি প্রতিরোধক। বিবাহের অনেক আচার ও কর্মকাণ্ডে বিস্মৃত যুগের ছিনতাইকৃত বিবাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। বরাগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বিবাহে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস, পথ-ভাড়ানো, গ্রন্থি বন্ধন, কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগের অনিচ্ছা, নোয়া-সিন্দুর, জাঁতী, কাজললতা, নিতবর বা কোলদরা, ছাদনাতলা প্রভৃতি বর্তমানে ভিন্ন তাৎপর্যে বাঙালী সমাজে টিকে থাকলেও মূলত এগুলি ছিনতাইকৃত বিবাহের স্মারক বলে অনুমিত হয়।[৫]

এরপর পণপ্রথার মাধ্যমে স্ত্রী পরিগ্রহণের রীতি লক্ষ করা যায়। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী এ ধরনের বিবাহ 'অসুর বিবাহ' নামে অভিহিত। বিবাহের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে বংশের প্রবাহকে রক্ষা করা। বিবাহ অনুষ্ঠানে যে-সব লোকজ আচার প্রচলিত তার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাটিরও প্রতিফলন রয়েছে। এ ছাড়া নবদম্পতির মধ্যে অন্তরঙ্গতা, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সম্প্রীতি, সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও এ আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালিত হয়। বিবাহের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখা এবং দাম্পত্যজীবনকে স্থায়িত্ব দেওয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যে বাঙালি বিবাহে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের অনুপুঙ্ক্ষ প্রতিভাস লক্ষ করা যায়। বিবাহ মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও অনুষ্ঠান হওয়ায় এতে লোকাচারের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যগুলোতে আমরা এই বিষয়টি অনুসন্ধানের প্রয়াস পাব।

ঘটক নিয়োগ

দু'জন নর-নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঘটক। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিই ঘটক। ঠিক কখন থেকে বাঙালি বিবাহে ঘটক নিয়োগের ব্যাপারটি চালু হয়েছে তা স্পষ্ট করে জানা যায় না, তবে অনেক আগে থেকে ঘটক নিয়োগের প্রচলন লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যেও ঘটকের প্রসঙ্গটি বিভিন্নভাবে এসেছে।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ঘটকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আখেটিক বা ব্যাধ খণ্ডে কালকেতুর বিবাহ উপলক্ষে ধর্মকেতু সোমাই পণ্ডিতকে ঘটক হিসেবে নিয়োগ করে —

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্মকেতু কিছু বলে।।
... ...
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত-নগরে কর কন্যার তপাস।।[৬]

সোমাই পণ্ডিত সঞ্জয়-সুতা ফুল্লরাকে কালকেতুর বধূ হিসেবে নির্বাচিত করে এবং সঞ্জয়কেতুকে কালকেতুর বংশপরিচয় সম্পর্কে অবহিত করে বলে যে —

সেই বরযোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।।[৭]

ঘটক পাত্র ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে শুধু মধ্যস্থতাই করত না বরং উভয়পক্ষকে বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করতেও ভূমিকা রাখত। পাত্রীপক্ষের কাছে পাত্রের গুণাবলীকে সে যেমন তুলে ধরত তেমনি পাত্রপক্ষের কাছে পাত্রীর যোগ্যতার বিবরণ পেশ করে বিবাহ কার্যকে ত্বরান্বিত করত। মুকুন্দরামের 'ধনপতি উপাখ্যান'-এ দেখা যায়, জনাই পণ্ডিত লক্ষপতি সদাগরকে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিয়ে দিতে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করছে। খুল্লনার সম্ভাব্য বরদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে সে ধনপতিকেই খুল্লনার একমাত্র যোগ্য বর হিসেবে লক্ষপতির কাছে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে লক্ষপতি ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিয়েতে সম্মতি দেয় —

ঘটকের মুখে শুনি বরের কীরিতি।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি।।[৮]

বিবাহে ঘটক নিয়োগ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটেও বাঙালি বিবাহে ঘটকের একটি বড় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যুগের প্রয়োজনে ঘটকের নানা রূপান্তর এলেও তার প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রায় অপরিহার্য।

বিবাহে পণ

পণ আদান-প্রদান বাঙালি বিবাহে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা। নৃবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'Marriage by Capture' বা ছিনতাইকৃত বিবাহ বলে উল্লেখ করা হয়, তারপরে পণের বিনিময়ে স্ত্রী সংগ্রহের রীতি লক্ষ্য করা যায়। এই রীতি অনুযায়ী কন্যাপক্ষকে পণ প্রদান করা হত। অবশ্য এর সঙ্গে নারীর আর্থিক বা বৈভবগত গুরুত্বের দিকটিও জড়িত বলে কেউ কেউ মনে করেন —

> হিন্দু নিম্নবর্ণের মেয়েরা অধিক বয়স পর্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করে এবং পিতার সংসারে অর্থকরী সহায়তা করে থাকে। মুসলিম চাষী এবং কারিগরদের মধ্যেও কন্যাপণের চল্ ছিলো। কন্যা পাত্রস্থ হলে পিতার অর্থকরী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কন্যাপণের এটি একটি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আবার, কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মাতার অপার স্নেহে বড় হয়; সে যৌবনে পদার্পণ করলে মাতা তার সতীত্ব পাহারা দেন। কন্যাপণের এটিও অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরং এবং চাকমা গোষ্ঠীর মধ্যে কন্যার মাতাকে অর্থ প্রদান করে মাতৃঋণ পরিশোধ করতে দেখা যায়। এ ছাড়া কৈবর্ত সম্প্রদায় ও আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে কন্যাপণ প্রদানের রীতি লক্ষ্য করা যায়। এরপর সমাজে পাত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরপণের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বৈদিককাল থেকে পণসহ কন্যা পাত্রস্থ করার রীতি সমগ্র বাঙালি সমাজের ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়

ব্যতিরেকে কন্যাপণের প্রচলন নেই বললেই চলে। মঙ্গলকাব্যেও কন্যাপণের প্রচলন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে কন্যাপণের উল্লেখ পাওয়া যায় —

পণ নিয়ম করি তুহ্মি যাহ ঘর।
সর্ব্বথায়ে দিব বিহা আন গিয়া বর।।[১০]

শুধু তাই নয় কন্যাপণ নিয়ে দর কষাকষি করার দৃষ্টান্তও মঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায়। *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে কালকেতুর পিতা ধর্মকেতু ও ফুল্লরার পিতা পুষ্পকেতুর মধ্যে কন্যাপণ নিয়ে 'দরাদরি' করতে দেখা যায় —

পুষ্পকেতু বোলে সখা কহি দরাদরি।
দুইখান খঞ্জিয়া দিবা তের বুড়ী কড়ি।।
ধর্ম্মকেতু বোলে সখা করি দরাদরি।
একখান খঞ্জিয়া দিমু কড়ি নয় বুড়ী।।[১১]

মুকুন্দরামের কাব্যেও কন্যাপণের উল্লেখ পাওয়া যায় —

আটে যদি বর আনি কহিয়ে মধুর বাণী
পণ বিনা করি সমর্পণ।।[১২]

পাকা-কথা ও লগ্নপত্র

পাত্র ও পাত্রীপক্ষের প্রাথমিক দেখাদেখির পর পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে পাকা কথা দেয়া হয়। পাকা কথা দেয়ার সময় বিভিন্ন লোকাচারের প্রচলন দেখা যায়। সমাজ ও অঞ্চল ভেদে লোকাচারগুলোর ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত টাকা, আংটি, বিচিত্র বসন দিয়ে পাকা কথা দেয়া হয়। কোথাও কোথাও পাত্রীর ক্রোড়ে ফলদান করে কিংবা তুলসী বদল করে পাকা কথা দেয়ার রীতি ছিল।

দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে পুষ্প-চন্দন দিয়ে ধনপতি ও খুল্লনার বিয়ের পাকা কথা দেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে-

ধনপতি বোলে মোর কার্য্যে নাহি হেলা।
সদয় হইয়া দেউক পুষ্প মালা।।
পুষ্পচন্দন দিলা সভার গোচরে।
বিবাহ নির্ব্বন্ধ কৈল গোধূলি শুক্রবারে।।[১৩]

বিবাহে দিনক্ষণ স্থিরকরণ এবং জ্যোতিষী/গণকের ভূমিকা

বিবাহে দিনক্ষণ স্থিরকরণের ক্ষেত্রে শুভদিন ও শুভক্ষণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আর এক্ষেত্রে জ্যোতিষী/পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও গণক প্রমুখের সহায়তায় শুভদিন ও শুভক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত পঞ্জিকা দেখে কিংবা নক্ষত্র বিচার করে শুভদিন ও শুভক্ষণ নির্ধারণের রীতি

লক্ষ্য করা যায়। আদিম সমাজে মানুষের মধ্যে যে জাদু-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিদ্যমান বলে মনে হয়। মঙ্গলকাব্যে দিনক্ষণ স্থিরকরণের ক্ষেত্রে জ্যোতিষী, গণক, পুরোহিত প্রমুখের সহায়তা গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে গ্রহ ও পাঁজি পড়ে শুভক্ষণ গুণে ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করে —

লগন করেন ওঝা শুভক্ষণ গুণি।
দ্বাদশী নির্ণয় কৈল উত্তর ফাল্গুনী।।[১৪]

দ্বিজ রামদেবের *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে বিবাহের দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপ্রের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় —

বিপ্রের বচন শুনি হরিষ অন্তর।
বিবাহের দিন পাইল শুক্রবাসর।।[১৫]

লগ্ন নির্ণয় করার পর ওঝাকে পুরস্কৃত করার কথা মুকুন্দরামও উল্লেখ করেছেন —

পুরস্কার পাইয়া গেল আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু সন্নিধানে।।[১৬]

বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে গণক, গ্রহ ওঝা বা জ্যোতিষীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় তা মূলত এক ধরনের অনিশ্চয়তাবোধ থেকে উৎসারিত। জ্যোতিষী কিংবা গণকের ওপর নির্ভরশীল হলেই যে দাম্পত্যজীবন সুখের হবে এমন নয়। কিন্তু আমাদের লোক-ঐতিহ্যে এদের প্রভাব এতটাই গভীর যে বর্তমান সময়েও বিবাহের দিনক্ষণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়।

বিবাহে নিমন্ত্রণ

আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ বিবাহ-কেন্দ্রিক লোকাচারের একটি অন্যতম অংশ। বিবাহের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত নিমন্ত্রণ-কার্যটি সম্পন্ন হয়। তবে এর পেছনে আরও কিছু সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ জড়িত। সমাজের মানুষকে তুষ্ট করে তাদের স্বীকৃতি লাভেরও প্রয়াস এটি। আদিম সমাজেও এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলকাব্যেও আমরা বিয়েতে নিমন্ত্রণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করি।

দ্বিজ রামদেবের *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে 'বিপ্রবর্গ'কে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে জ্ঞাতিদের নিমন্ত্রণ জানাতে দেখা যায়-

দিগে দিগে বিপ্রবর্গ পাঠাইআ তখন।
জ্ঞাতি নিমন্ত্রিয়া আনে আপনা সদন।।[১৭]

এ ছাড়া পত্র লিখে বন্ধু কিংবা জ্ঞাতিদের নিমন্ত্রণ করার দৃষ্টান্ত মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে পাওয়া যায়-

লিখন করিয়া পাঁতি আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি
দেশে দেশে পাঠাল বার্তন।।[১৮]

নিমন্ত্রণ বিবাহ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সরব উপস্থিতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান একটি উৎসবে পরিণত হয়।

অধিবাস

বিবাহ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে মূলত অধিবাসের মধ্য দিয়ে। অধিবাস সাধারণত বিয়ের একদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাস উপলক্ষে বরণ-ডালা সাজানোর রীতি লক্ষ্য করা যায়। সেই ডালায় ধান, দূর্বা, হরিদ্রা, ঘি, সিঁদুর, শঙ্খ, ফুল-ফল, সোনা-রূপা-তামা প্রভৃতি দ্রব্য রাখা হয়। অধিবাস পর্বটি পুরোহিত কর্তৃক পরিচালিত হয়। পুরোহিতের কৃত্যাদি শেষ হলে অধিবাসের ডালা ও অন্য দ্রব্যসামগ্রী বর ও কনের কপালে স্পর্শ করানো হয়। এটিকে অভিহিত করা হয় পুরোহিত কর্তৃক বর-কনে বরণ বা আশীর্বাদ হিসেবে। মঙ্গলকাব্যে অধিবাসের অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে অধিবাসের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'গৌরীর অধিবাস' অংশে পার্বতীকে হরিদ্রাযুক্ত বস্ত্র পরে গন্ধাধিবাসে বসতে দেখি —

পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুক্ত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।।
মিলিয়া যত মুনি করেন বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে।।[১৯]

কালকেতু-ফুল্লরার বিয়েতেও অধিবাস ডালা সাজানোর উল্লেখ পাওয়া যায় —

নিয়া অধিবাস-ডালা কিরাতনগরে গেলা
বন্ধুমেলি সোমাই ব্রাহ্মণ।।
বন্দি পদ-সরসিজ আসনে বসাল্য দ্বিজ
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি
চারিদিকে বন্ধুগণ মেলা।।
ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস।
ছায়া মণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে
হীরাবতী-হৃদয়ে উল্লাস।।[২০]

'ধনপতি উপাখ্যান'-এ মুকুন্দরাম অধিবাস আচারটির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। অধিবাস উপলক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ এখানে পাওয়া যায় —

ফাল্গুন উত্তম মাস কালি হবে অধিবাস
শুনি আনন্দিত সদাগর।।
... ...
তৈল সিন্দূর পান গুয়া বাটা ভারি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব কাঁচ কাটা।
পাট ভরি নিল খই ঘড়া ভরি নিল দই
সাজিয়া সুরঙ্গ নিল বাটা।।
ক্ষীরীপুরি গঙ্গা জল কান্দি সুর্দ্ধ নারিকেল
চিনিতে বান্ধিয়া নিল গাছ।
চাল ডাল রাশি রাশি জোড়ে জোড়ে নিল খাসী
সাজুড়িয়া নিল বড় মাছ।।
সর্বস্ব পুটুলী ভরা বান্ধি নিল কোল সরা
সুতা নিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী পরিতে হীরার কড়ি
বিদমালা সুবর্ণ জড়িত।।
চিনি চাঁপা মর্তমান সরস গুবাক পান
হরিদ্রা রঞ্জিত সুবসন।
গোরোচনা নিল শঙ্খ চামর চন্দন পঙ্ক
পুষ্পমালা কজ্জ্বল দর্পণ।।
কপালে জুড়িয়া ফোটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সকলেতে বসিল কম্বলে।[২১]

অধিবাসে ব্যবহৃত তৈল, সিঁদুর, পান-সুপারি, গঙ্গাজল, নারিকেল, চাল-ডাল, খাসী, মাছ, পাটের শাড়ি, হলুদ প্রভৃতির বর্ণনা উপর্যুক্ত অংশে পাওয়া যায়।

দ্বিজ মাধব *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে খুল্লনার অধিবাসের কথা উল্লেখ করেছেন—

শুভক্ষণে অধিবাস কৈল খুল্লনার।।[২২]

দ্বিজ রামদেবের *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে মহোৎসবের মধ্য দিয়ে ধনপতির অধিবাস কার্যটি পালন করতে দেখি—

মহোৎসবে ধনপতি করে অধিবাস।।[২৩]

অধিবাস অনুষ্ঠানে বর ও কনের হাতে পুরোহিত বা এয়োস্ত্রী বিশেষ ধরনের সুতা বেঁধে দেয়। একে মঙ্গলসুতা বা মঙ্গলসূত্র নামে অভিহিত করা হয়। বর-কনের দাম্পত্য জীবনের

সুখ-সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা এর মূল উদ্দেশ্য। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে গৌরীর হাতে এয়োস্ত্রীরা হুলাহুলি করে আনন্দিত চিত্তে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়—

এয়ো আসি মিলি করি হুলাহুলি
মঙ্গলসূত্র বাঁধে করে।।[২৪]

অন্যদিকে কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহে পুরোহিত ফুল্লরার হাতে মঙ্গলসূত্র, শিরে 'মুড়লা' বেঁধে দেন —

দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে বান্ধিল মুড়লা শিরে
আয়্য দেয় জয় চারিভিতে।[২৫]

এখানে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয়ার সাথে সাথে এয়োস্ত্রীদের জয়ধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত হতে দেখা যায়। 'ধনপতি উপাখ্যানে' ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে ব্রাহ্মণ দোনাই পণ্ডিত বেদ পড়ে খুল্লনার হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেন —

করি তথা স্বর ভেদ ব্রাহ্মণে পড়েন বেদ
সূত্র বান্ধে দোনাই পণ্ডিত।।[২৬]

শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে মঙ্গলসূত্র বেঁধে আশীর্বাদ করতে দেখা যায় —

বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দ্বিপ পাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা।
কণক সিথি শিরে অঙ্গুরি দিয়া করে
করিল আসিস যোজনা।।[২৭]

দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে মঙ্গলসূত্র বাঁধার একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেখা যায় নারীগণ সুতা পাকিয়ে তা খুল্লনার হাতে বেঁধে দেয় —

বাহির করিয়া সূতা নারীগণে ধরে।
পাকাইয়া বান্ধিল তাহা খুলনার করে।।[২৮]

মঙ্গলসূত্র অধিবাস অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এটি যে একটি অবশ্য পালনীয় লোকাচার তা মঙ্গলকাব্যগুলোতে এর ব্যাপক বর্ণনা থেকেই ধারণা করা যায়।

গায়ে হলুদ

বিয়েতে গায়ে-হলুদ বাঙালি সমাজে একটি অপরিহার্য লোকাচার। কখনো অধিবাসের অঙ্গ হিসেবে কখনো বা পৃথকভাবেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। মূলত দেহশুদ্ধি এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এটি পালিত হয়। এছাড়াও গায়ে হলুদ– "(১) দেহের দুর্গন্ধ দূর এবং দেহের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে; (২) কুদৃষ্টি প্রতিরোধ করে, এবং (৩) দেহকে সৃষ্টিশীল করে তোলে।"[২৯]

গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানটি বর্তমান সময়েও বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। সাধারণত বিয়ের আগের দিন পাত্রের বাড়ি থেকে হলুদ-বাটা, মেহেদী-বাটা, গিলা-বাটা, মেথি-বাটা,

সুন্দা, ধান-দূর্বা, পান-সুপারি, মিষ্টি, তেলসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে ডালা সাজিয়ে পাত্রীর বাড়িতে পাঠানো হয়। একইভাবে পাত্রের বাড়িতেও পাত্রীপক্ষ থেকে ডালা সাজিয়ে পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে। এ সময় অনেক জায়গায় কনে ও এয়োস্ত্রীদের লালপাড় হলুদ শাড়ি এবং বরকে হলুদ পাঞ্জাবি পরতে দেখা যায়। বাঙালি ছাড়াও আসামের অহোম চুথিয়া জাতি, দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর লোক, উড়িষ্যার কোনো কোনো জাতি এবং মুম্বাইয়ের কোনো কোনো অঞ্চলে বিবাহে গায়ে হলুদের প্রচলন রয়েছে। গায়ে হলুদের ব্যাপক প্রচলনের দৃষ্টান্ত মঙ্গলকাব্যগুলোতেও রয়েছে।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে সরাসরি গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানটি দেখা যায়নি। কিন্তু কালকেতু উপাখ্যানে 'গৌরীর অধিবাস' কিংবা ধনপতি উপাখ্যানের 'বিবাহের নান্দীমুখ' লোকাচারে 'হরিদ্রাযুক্ত ধুতি' এবং 'হরিদ্রা-রঞ্জিত ধুতি'র কথা উল্লেখ পাওয়া যায় —

১. পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।।[৩০]

২. সকল দোষ হীন আজি শুভদিন
ধরে সবে মনোহর বেশ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত ধুতি পরিয়া রূপবতী
বসিলা বাপের সকাশে।।[৩১]

গায়ে-হলুদ ব্যতিরেকে বাঙালি সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান বাঙালি বিবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। হলুদ ব্যবহার সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত প্রণিধানযোগ্য— "Yellow colour is a scarer of melignant spirits who do not venture to come near objects which are dyed on tinted with that colour."[৩২]

মঙ্গল-স্নান

গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি লোকাচার হচ্ছে মঙ্গল-স্নান। সাধারণত গায়ে-হলুদের পর মঙ্গল-স্নানের আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও গায়ে-হলুদের আগেও এই লোকাচারটি পালিত হতে দেখা যায়। কেউ কেউ গায়ে-হলুদ এবং মঙ্গল-স্নানকে অভিন্ন মনে করেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যে খুল্লনার শিরে কলসের পর কলস পানি ঢেলে মঙ্গলবিধান মতে স্নান করাতে দেখি —

জয় জয় দেহি কেহ পরম হরিষে।
শিরে জল ঢালে কেহ কলসে কলসে।।
মঙ্গল বিধানে স্নান করি সুবদনী।
শ্বেত নেত্র সূত্র দিয়া বান্ধিল তখনি।।[৩৩]

মঙ্গলগীত বা গান

বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীতের কদর রয়েছে। সাধারণত বিবাহ অনুষ্ঠানে সধবা নারী বা যুবতীগণ মিলিত হয়ে যে গান গেয়ে থাকে তাকে মঙ্গলগীত বলে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিবাহ অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য এবং নব-দম্পতির মঙ্গল কামনায় বর্তমানেও এই গীত গাওয়া হয়। মঙ্গলকাব্যে ব্যাপকভাবে মঙ্গল গীতের উল্লেখ রয়েছে।

মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধনপতি বিবাহ কার্যসম্পন্ন করে গৃহে ফিরলে যুবতীদের মঙ্গল গীত গাইতে দেখি—

বিভা করি গৃহে আল্য সাধু ধনপতি।
আনন্দে মঙ্গল গাএ জতেক যুবতি।।[৩৪]

অন্যদিকে শ্রীপতির বিবাহে শ্রীপতি 'ছায়ামণ্ডপে' যখন বসে তখন যুবতীদের মঙ্গলগীত গাইতে শুনি—

আনন্দ মঙ্গল গায় জতেক যুবতি।
ছায়ামণ্ডপে আসি বসিল শ্রীপতি।।[৩৫]

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধনপতির অধিবাসের এবং প্রস্তুতিকালে 'বরানুগমন' অংশে মঙ্গল গীতের উল্লেখ পাই—

১. আগে পিছে সারি সারি নানা দ্রব্য লয়্যা ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।।[৩৬]

২. মদন মূরতি সাধু ধনপতি
বসিলা গাম্ভারী পাটে।
বদনে নিন্দে বিধু চৌদিকে বারবধূ
মঙ্গল গায় গীত নাটে।।[৩৭]

বিবাহ-অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। সাহিত্যেও পাই এর ব্যাপক উদাহরণ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিতামৃত, মৈমনসিংহ-গীতিকাসহ* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত-নৃত্যের প্রসঙ্গ রয়েছে:

> বিবাহের গানে অনিবার্যভাবে ঘুরে-ফিরে যে সমস্ত বিষয় আসে তা হল পুরাণ-প্রসঙ্গ, লীলাতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব; বিভিন্ন পৌরাণিক লৌকিক দেব-দেবী এবং তাদের চরিত্র ঘটনা কাহিনী; কৃষি-শস্য, ফুল-ফল, লতা-পাতা-বৃক্ষ, নদী-পুকুর-মাছ, পাখিসহ অন্যান্য ইতর প্রাণী; দুধ-জল-মিষ্টি; বিভিন্ন ক্রীড়া, নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী বিশেষ করে অন্তঃপুরের বিষয় ইত্যাদি। এ-সমস্ত কিছুরই উত্থান বা ব্যাখ্যানে বর-কন্যারই বিষয় প্রতীকাকারে বর্ণিত হয়।[৩৮]

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ

বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার নান্দীমুখ। নান্দীমুখ হলো হিন্দুদের আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, শুভ কার্যাদি যেমন– বিবাহ, গৃহ প্রবেশ প্রভৃতির পূর্বে যে শ্রাদ্ধ পালন করা

হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকে 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ'ও বলা হয়। হিন্দুদের সমস্ত সংস্কারজাত অনুষ্ঠানেই নান্দীমুখ প্রচলিত রয়েছে। মূলত যাঁদের অনুগ্রহে আমরা পৃথিবীতে এসেছি তাঁদেরকে স্মরণ ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের উদ্দেশে অন্নজলাদি অর্পণের জন্যই এই অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। বিবাহ মানবজীবনের একটি আনন্দঘন উৎসব। আনন্দের সময় শ্রাদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই আনন্দ উৎসবে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে সাধারণত এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। নান্দীমুখ জনপ্রিয় আচার হওয়ায় মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে নান্দীমুখের উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যেও এই আচারটি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কবি মাতৃকা পূজা এবং বসুর পূজা শেষে নান্দীমুখের বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন —

নৈবেদ্য দিয়া ভুরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি করিলা হেমগিরি
নান্দীমুখের বিধান।[৩৯]

অন্যদিকে কালকেতুর বিবাহ-উদ্যোগে ষোড়শ মাতৃকা পূজা এবং অধিবাস যথাবিধি পালনের পর আনন্দিত চিত্তে নান্দীমুখ আচারটি পালন করা হয় —

ষোড়শ মাতৃকা পূজা ঘৃত ঢালি চেদিরাজা
পূজা তথি কৈল পুরোহিতে।।
কর্মকাণ্ড ছিল যত সমাধিল পুরোহিত
দেখি ধর্মকেতুর কৌতুক।
তথা অধিবাস আদি কৈলা ব্যাধ যথাবিধি
আনন্দে করিলা নান্দীমুখ।।[৪০]

মুকুন্দরামের 'ধনপতি উপাখ্যান'-এ খুল্লনার নান্দীমুখ অনুষ্ঠানে নান্দীমুখ আচারের পূর্বে গৌরী, পদ্মা, মেধাবতী, সাবিত্রী প্রমুখের পূজা করতে দেখি —

পূজিল প্রতিমা পাতি গৌরী পদ্মা মেধাবতী
সাবিত্রী বিজয়া জয়া যথা।
স্বাহা স্বধা বেদসমা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা
কুলদেবী কুলের দেবতা।।
ঘৃত দিয়া করি ত্বরা কাঁথে ছিল বসুধারা
কৈল নান্দীমুখের বিধান।[৪১]

অভয়ামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি 'ত্রিযামা বহিআ' গগনের প্রকাশ ঘটলে লক্ষপতি খুল্লনার বিবাহ উপলক্ষে নান্দীমুখের আয়োজন করে —

ত্রিযামা বহিআ গেল প্রকাশ গগন।
লক্ষপতি নান্দিমুখ করিল তখন।।[৪২]

আমরা দেখি যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো নান্দীমুখ এবং এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাধারণত দিবসের পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন করা হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ একটি জনপ্রিয় আচার। মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁদের কাব্যে নান্দীমুখের কৃত্যাবলী বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন।

জলসহা বা জলভরা

সাধারণত হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে বিবাহ-স্নানের জন্য বিশেষ জল সংগ্রহের রীতি রয়েছে। জল সংগ্রহের এই লোকাচারটিকে বলা হয় 'জলসহা', 'জলসওয়া', কোথাও কোথাও এই আচারটিকে 'চোরপানি'ও বলা হয়। এই আচারটি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দেখা যায়। বিশেষ করে পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে হিন্দুবিবাহে জল সংগ্রহের রীতিটি রয়েছে। তবে অঞ্চল ভেদে জল সংগ্রহের রীতির ভিন্নতা রয়েছে –

> ঢাকা বরিশাল, পাবনায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে গিঁট বেধে ভোরে কাক ডাকার আগে অন্যান্য এয়োসহ কোন পুকুর বা নদীতে যায়। স্বামী ছুরি বা খাঁড়া দিয়ে জলে দাগ দেয়, স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান থেকে জল ভরে আনে। ঢাকায় এই পূর্ণ কলসকে 'নিদ্রাকলস' বলা হয়। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি বহু জেলায় ঐ পূর্ণ কলসে পাঁচটি ফল ও একটি মালা রেখে নতুন কাপড়ে মুখ বেঁধে বাসরে রাখা হয়। এই জেলাগুলিতে এই আচারটি পালন করেন প্রধানত কনের মা-বাবা একত্রে। তাঁদের কারও অভাবে তখন অন্য স্বামী-স্ত্রী জোড়ে এই কাজ করেন। কনে-সম্প্রদানের পর বর-কনে বাসরে এলে বর হাঁড়ির মুখ সন্তর্পণে খুলে নির্দেশ মতো ঐগুলি বার করে ও প্রশ্নের জবাব দেয়। এয়োদের সংস্কার ঐগুলি ভাবী সন্তানের দ্যোতক। এই সকল জেলাগুলিতে এই অনুষ্ঠান 'চোরপাণি' নামে পরিচিত।[৪৩]

বগুড়া অঞ্চলে পাঁচ এয়োস্ত্রী মিলে এই জল আনে এবং তা দিয়ে বাসি বিয়ের স্নান করানো হয়। কুমিল্লা ও সিলেটে কাকপক্ষী ডাকার আগে এয়োস্ত্রী সাতঘাটের জল সংগ্রহ করে। চট্টগ্রামে মুসলিম পরিবারে পাঁচ পুকুরের জল এনে বরকে গোসল করানো হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জলসহা লোকাচারটির বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যায়, যা মঙ্গল কাব্যেও লক্ষ্য করি। মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে নানা বাদ্য-বাজনাসহ এয়োস্ত্রীরা প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে জল সংগ্রহ করে —

নানাজাতি বাদ্য বাজে শতে শতে আইহ সাজে
জল সাধে প্রতি ঘরে ঘরে।[৪৪]

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে গৌরীর বিবাহ অনুষ্ঠানে গৌরীর মা মেনকা অন্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে জল সংগ্রহ করেন—

কাঁকেতে হেমঝারি মেনকা মিলি নারী
জল সহে ঘরে ঘরে।[৪৫]

অন্যদিকে 'ধনপতি উপাখ্যানে' খুল্লনা-ধনপতির বিবাহে খুল্লনার মা রম্ভাবতীকে জল সংগ্রহ করতে দেখি—

সুবেশ সুধীর মতি জল সহে রম্ভাবতী
সখীগণ সংহতি জোগান।।[৪৬]

অভয়ামঙ্গল কাব্যে রম্ভাবতী মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে, শিরে মালা, শরীরে নানা সাজ-সজ্জা, বাদ্য-বাজনাসহ জল সংগ্রহের আচারটি পালন করেন —

চলিল রম্ভা নারী সঙ্গে লইআ সহচরী
শিরে শোভে মালাকার।
কটিতে গাগরি রাখি সঙ্গে লইআ সব সখী
চলে ধনি জল ভরিবার।।
... ...
এমনি সাজিআ রঙ্গে নানাবিধ বাদ্য সঙ্গে
আইলেন সরোবর তীরে।[৪৭]

মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যে 'জল-সাঞি' মঙ্গলাচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। লহনার মা রম্ভাবতী নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, আগে-পাছে এয়োস্ত্রীদের নিয়ে, ঘন ঘন জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে শুভক্ষণে জল সংগ্রহ করেন —

নানা অলঙ্কার পরি সঙ্গে লইয়া সহচরী
জল সাঞিতে করিল গমন।
রম্ভা করিয়া মাঝে আহিগণ আগে পাছে
দেখিয়া হরিষ প্রজাগণ।।
... ...
লইয়া আহিগণ রম্ভা হরষিত মন
চলে আই হইয়া সারি সারি
মিলিয়া ত আহিগণ জয়ধ্বনি দিয়া ঘন
শুভক্ষণে ঘটে ভরে বারি।।[৪৮]

আমরা দেখি যে, বিবাহ উপলক্ষে 'জলসহা' লোকাচারটি অর্থাৎ বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বা পুকুর থেকে, নদী থেকে জল সংগ্রহরূপ মঙ্গলাচারটি ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল, ফলে মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে এমনকি বর্তমানেও কোনো কোনো অঞ্চলে এই লোকাচারটির প্রচলন রয়েছে।

বরের সাজ-পোশাক

বিয়েতে সাজ-পোশাক, অলঙ্কারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর যখন কনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে তখন তাকে বিশেষ পোশাক পরানো হয়, সেই সাথে মাথায় মুকুট ও অন্যান্য অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু বর-কনে, সেখানে বর-কনেকে বিশেষভাবে সাজানো হয় অর্থাৎ যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বর-কনেকে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়। মঙ্গলকাব্যে বর-কনের সাজসজ্জার ব্যাপক উদাহরণ মেলে।

কালকেতুর বিবাহে কালকেতুকে শিরে 'মুকুট-মণ্ডিত' হয়ে সজ্জিত হতে দেখি —

মুকুট-মণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
বন্দে গুরু দ্বিজের চরণ।।[৪৯]

অন্যদিকে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে ধনপতি গলায় রত্নমালা, শিরে মুকুট এবং অঙ্গে চন্দন লেপন করে বরসাজে সজ্জিত হয় —

গোধূলি হৈল বেলা সাধু চাপে দোলা
গলাতে দিল রত্নমালা।
মুকুট শিরে রোপে চন্দন অঙ্গে লেপে
শোভয়ে হেম তাড় বালা।।[৫০]

কনে সাজ

মঙ্গলকাব্যগুলোতে বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যা সাজেরও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

বিবাহ সাজের মধ্যে প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে খুল্লনাকে ললাটে সিঁদুর, চোখে কাজল, দুই কানে মকর কুণ্ডল, গলায় গজমতির হার ইত্যাদি সাজে সজ্জিত করা হয়। তা ছাড়া —

পদযুগে পদভূষা দিল মনোহর।
বিবাহেক বেশ তথি সাজোএ সত্বর।।
বাহুতে ডাঙ্গ দিল করে দিল শংখ।
তাহা দেখি যোগীগণের যোগ হয় ভঙ্গ।।[৫১]

মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যে ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে খুল্লনার খোপায় পুষ্পহার, চোখে 'কজ্জ্বলের রেখা', নাকে মণিময় মুক্তা, কণ্ঠে কণ্ঠমণি হার, প্রবাল, শঙ্খ এবং পাটের শাড়ি পরিধান করতে দেখা যায় —

চিরুণী আচড়ি কেশ করিয়া সুসার।
কানড়ি বান্ধিয়া খোফায়ে দিল পুষ্পহার।।
কজ্জ্বলের রেখা দিল নয়নযুগলে।
খঞ্জন পড়িল যেন পঙ্কসুত-দলে।।

শ্রুতিমূলে শোভা করে রতনকুণ্ডল।।
অরুণ সমান যার জ্যোতি ঝলমল।।
মণিময় মুক্তা শোভে নাসিকা উপর।
কণ্ঠে কণ্ঠমণি হার অতি মনোহর।।
... ...
বাছিয়া পরিল রামা দিব্য পট্ট শাড়ী।
বিধিয়ে নির্ম্মিল যেন সোনার পোতলী।।[৫২]

তৎকালে রেশমাদি বস্ত্র, পাট, পাটজাত বস্ত্র বা পাটের শাড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* বা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পাটজাত দ্রব্য বা পাটের শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিবাহের দিন বর-কনেকে মনোরমভাবে সাজানো হয়ে থাকে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে তৎকালীন সমাজে সাজসজ্জার প্রতি মানুষের যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনেকে নানা পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধনী, অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে মনোরম সাজে সাজাতে দেখি। বর-কনের এই সাজসজ্জা যেমন আমন্ত্রিত অতিথিদের আকৃষ্ট করে তেমনি বর-কনে পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বর শোভাযাত্রা ও বরযাত্রী

বর নানাভাবে সজ্জিত হয়ে কনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী তার সহযাত্রী হয়, এই সহযাত্রীদের বলা হয় বরযাত্রী। সাধারণত বিবাহকালে বরপক্ষ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রমাণের লক্ষ্যে সমাজে বসবাসরত নানা শ্রেণীর লোকদের এই শোভাযাত্রায় সঙ্গী করতো।

মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতু শুভবেলা দেখে বরযাত্রীদের নিয়ে কনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। কবির বর্ণনায় বিবাহ-যাত্রায় আমরা কোলাহল ও হাস্যকৌতুকের দৃশ্য দেখতে পাই—

গমনের শুভবেলা বাউরী জোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ।
... ...
আইল বরযাত্রিগণ সঞ্জয়ের নিকেতন
নমস্কার হৈল কোলাহল।
কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলী মারে
গুয়া কাটায় হৈল গুণ্ডগোল।
সমুখে দেউটি জ্বলে হাস্যকথা কুতুহলে
কহে যত বরযাত্রিগণ।[৫৩]

মুকুন্দরামের 'ধনপতি উপাখ্যান'-এ বর-কনের পক্ষে 'কোন্দল চুলাচুলি, ধূলাখেলা, ঢেলা মারা ইত্যাদি আছে। এই কোন্দল, ধূলাখেলা, ঢেলা ছোড়া ইত্যাদি আনন্দ-স্ফূর্তি অশুভ পথে মোড় নিতে পারে তা চিন্তা করে কন্যার বাবা লক্ষপতি সে দ্বন্দ্ব ভেঙ্গে দেন —

দু দলে গালাগালি কোন্দল চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউটি না ছাড়ে।
ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে।।
বুঝিয়া কার্যের গতি দ্বন্দ্ব ভাঙ্গে লক্ষপতি
দোনাই দ্বিজ সমঞ্জসে।[৫৪]

অভয়ামঙ্গল কাব্যে ধনপতি আগে-পাছে বন্ধুদের নিয়ে বিবাহ-শোভাযাত্রায় গমন করে —

চলে সাধু ধনপতি বিবাহ উৎসব অতি
আগে পাছে চলে বন্ধুগণ।[৫৫]

আমরা দেখি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটে বিবাহ যাত্রায়। বরপক্ষ তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম অনুযায়ী লোকজন নিয়ে শুভক্ষণ দেখে কনের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। অনেক সময় বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের মধ্যে হাসি-তামাশা করতে করতে ঝগড়া-বিবাদের আকার ধারণ করে। অতঃপর মুরব্বীদের মধ্যস্থতায় তার নিষ্পত্তি হয়।

বিবাহে বাদ্য-বাজনা

বিবাহ উদ্দেশ্যে বর-কনের বাড়ি যাত্রাকালে এবং বিভিন্ন লোকাচার পালনের সময় বাদ্য-বাজনার আয়োজন প্রায় প্রতিটি বিবাহ অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। এ দৃষ্টান্ত প্রায় প্রতিটি মঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহ অনুষ্ঠানে কালকেতু যখন বিবাহ উপলক্ষে পাড়াপড়শী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে, তখন —

বরযাত্রা পড়ে সাড়া বাজয়ে ঢেমচা কাড়া
চারিদিকে বাজয়ে বাজন।[৫৬]

দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ঢাক, সানাই ইত্যাদি সমেত এক মনোজ্ঞ বাদ্যবাজনার আয়োজন করা হয় —

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান।
ভেউর ঝাঁঝরি বাজে অনেক সন্ধান।।
ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল।।[৫৭]

অভয়ামঙ্গল কাব্যেও বাদ্য-বাজনার বিশাল আয়োজন করা হয়। বিবাহকে একটি আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য এই বাজনার আয়োজন করা হয় এবং এই বাজনা যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায় ততই তারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করত। *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে আমরা দেখি, ধনপতির বিবাহ যাত্রাকালে যে বাদ্যশব্দের আয়োজন করে তাতে 'ঢাকিল গগন' —

চলে সাধু ধনপতি বিবাহ উৎসব অতি
আগে পাছে চলে বন্ধুগণ।
সীমন্তিনী ঠাট লড়ে মহী পূর্ণ জয়কারে
বাদ্যশব্দে ঢাকিল গগন।।[৫৮]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাজি পোড়ানোর উদাহরণ মেলে। ধনপতির বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ যাত্রাকালেও আতস বাজি পোড়ানো হয়, যা দেখে মনে হয় যেন বিজলী চমকাচ্ছে —

অনেক দারু সাজি কৈল আতস বাজি
এক কালে যেমন বিজলী।।[৫৯]

গাঁটছড়া বা গিঁট বন্ধন বিবাহের একটি মাঙ্গলিক আচরণ। সম্প্রদানের পর বর-কনের কাপড়ের আঁচলে আঁচলে গিঁট দেয়া হয় এ অনুষ্ঠানে। অপরিচিত দুটি নর-নারীকে শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব দূর করে নৈকট্য ও মিলনের ভাব আনার জন্যই সম্ভবত এই ধরনের আচার পালন করা হয়। মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে এ গাঁটছড়া বা গিঁট বন্ধন অনুষ্ঠানে বাদ্য-বাজনার কথা বলেছেন—

বাজায়্যা ঢেমচা পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটিছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।[৬০]

'ধনপতি উপাখ্যান'-এ শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহ অনুষ্ঠানে 'গাঁটছড়া বাঁধা' মঙ্গলাচারের ক্ষেত্রেও বাদ্য-বাজনার আয়োজন করা হয়েছে—

বাজয়ে দুন্দুভি পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঠিছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতি।[৬১]

তাছাড়া *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে খুল্লনার অধিবাস মঙ্গলাচারের ক্ষেত্রে দ্বিজ রামদেব নানাবিধ বাদ্য-বাজনার কথা বলেছেন—

ঝাঝা ঝিঝি তাল বাজে নানাবিধ বাদ্য বাজে
খুলনার করে অধিবাস।[৬২]

এমনকি জল ভরার জন্য যখন খুল্লনার মা রম্ভাবতী তাঁর সহচরীদের নিয়ে সরোবর তীরে যান তখনও দ্বিজ রামদেব বাদ্য-বাজনার কথা বলেছেন —

এমনি সাজিআ রঙ্গে নানাবিধ বাদ্য সঙ্গে
আইলেন সরোবরতীরে।[৬৩]

দ্বিজ মাধব তাঁর *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যেও জলসহা উপলক্ষে বাদ্য-বাজনার কথা উল্লেখ করেছেন —

পৌরজন ধনি ধনি জল-সাঁয়ে সুবদনী
হেমঘট লইয়া কটিমাঝে।
শিরে শোভে 'শিরি' থালা গলে শোভে পুষ্পমালা
আগে পাছে নানা বাদ্য বাজে।।[৬৪]

অভয়ামঙ্গল কাব্যে কন্যাসম্প্রদানকালে বাদ্য-বাজনার আয়োজন করা হয় —

ডমরু ডিন্ডিভি বাজে করি কুতূহলি।
ঢেমসি বাজাএ কেহ দেই করতালি।।
কৈন্যা সমর্পিয়া যেন মন কুতূহল।[৬৫]

কাজেই আমরা দেখি বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্য-বাজনা একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। বরযাত্রা থেকে শুরু করে বিবাহের বিভিন্ন মঙ্গলাচার পালনে বাদ্য-বাজনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকালেও বিবাহ অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ বাদ্য-বাজনার আয়োজন দেখা যায়।

> বিয়ের বাজনা অনার্য তথা আদিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া। উলুধ্বনি এবং বিয়ের গানও আর্যাচার নয়। বিয়েতে কোন অশুভশক্তি বা ভূত-প্রেতাদি যাতে নবদম্পতির ক্ষতি করতে না পারে তারজন্য বা অশুভশক্তিকে সতর্ক করে দেবার জন্য হয় গান বাজনা এবং উলুধ্বনি। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে বেদগান ছাড়া অন্য কোন গান নেই। তাই নৃত্য-গীত-বাদ্য ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা শূদ্রাদি জাতির জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্য-গীত-বাদ্য নিষিদ্ধ মুসলমান সমাজেও। যদিও লোকাচারে এ সবই স্থান পেয়েছে।[৬৬]

বরবরণ বা জামাতা বরণ

বরবরণ বা জামাতা বরণ বাঙালি বিবাহে একটি আনন্দঘন, সুমধুর ও সর্বজনীন লোকাচার। বিবাহ উদ্দেশ্যে বর/জামাই বিবাহ সভায় উপস্থিত হলে তাকে ঘিরে যে স্ত্রীআচার পালিত হয় তাই বরবরণ বা জামাতা বরণ। বরবরণ একটি বিশিষ্ট স্ত্রী-আচার। তবে সমাজ ভেদে এই আচার পালনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়।

> পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বর বিবাহ-সভায় যাইবার মুখেই পুরস্ত্রীরা বরণডালায় (কুলা) সজ্জিত যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা বরকে বরণ করেন। এই বরণ-প্রক্রিয়াটি দেখিবার মত। তাঁহারা বরণডালা হইতে এক একবারে দুইটি দ্রব্য লন এবং অপূর্ব ভঙ্গীতে হাত দুইটি নাচাইয়া সেগুলি বরের শরীরে ও মস্তকে ছোঁয়াইয়া দুইদিকে ফেলিয়া দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বরবরণ সাধারণতঃ সম্প্রদানের পূর্বমুহূর্তে ছাদনাতলায় (বিবাহস্থান) সম্পন্ন হয়। কন্যাদাতা কর্তৃক বরকে বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিয়া হাঁটুতে ধরিয়া বরণ করিবার পর পাঁচ কি সাতজন এয়োস্ত্রী বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হইয়া শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালায় পূর্ব হইতে সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে বরণ করেন।[৬৭]

মঙ্গলকাব্যেও বৈচিত্র্যপূর্ণ আচারের মধ্য দিয়ে বরকে বরণ করতে দেখা যায়।

মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে শিব-গৌরীর বিবাহে বর কনের বাড়িতে উপস্থিত হলে, কনের পিতা হিমালয় জামাতা শিবকে 'অঙ্গুরি বসন মালা' দিয়ে যথাযথভাবে বরণ করার কথা বলেছেন —

অঙ্গুরি বসন মালা গিরিরাজ শিরে দিলা
যথাবিধি করিলা বরণ।[৬৮]

স্থান-কাল-অবস্থা ভেদে বরণ লোকাচারটির পার্থক্য দেখা যায়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহ অনুষ্ঠানে কালকেতু বিবাহ সভায় উপস্থিত হলে প্রথমে পুরোহিত তাকে বরণ করেন। তারপর জামাতাকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে, শিরে ধান-দূর্বা, 'নিছিয়া' পান ফেলে এবং গলায় বন-ফুলের মালা পরিয়ে প্রচলিত আচারের মাধ্যমে বরণ করতে দেখা যায় —

স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করেবরণ করিলা বরে
বীর-ধড়া স্ফটিক-কুণ্ডলে।।
করিয়া বিরল স্থান জামাতারে করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দূর্বাধান নিছিয়া ফেলিলা পান
গলে দিল বন-ফুল-মালা।।[৬৯]

'ধনপতি উপাখ্যানে' ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে ধনপতি খুল্লনার বাড়িতে উপস্থিত হলে নানা কৃত্যের মধ্য দিয়ে তাকে বরণ করা হয়। জামাতাকে 'লোহিত কম্বলে' বসানো হলে কনের পিতা লক্ষপতি আংটি, বস্ত্র, চন্দন ইত্যাদি দিয়ে তাকে বরণ করেন—

অঙ্গুরী অঙ্গদবালা ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ।।[৭০]

কনের পিতা কর্তৃক বরণ কার্য সম্পন্ন হলে কনের মাতা রম্ভাবতী নানান স্ত্রী-আচারের মধ্য দিয়ে বরের চরণে দই ঢেলে তাকে বরণ করেন —

রম্ভাবতী স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি।
বরের চরণে আনি ঢালিলেন দধি।।[৭১]

বরবরণের ক্ষেত্রে কনের পিতা, মাতা এবং এয়োস্ত্রীদের আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে ধনপতি-লহনার বিবাহ অনুষ্ঠানে লহনার পিতা লক্ষপতি 'পাদ্য অর্ঘ্য', 'বস্ত্র-অলঙ্কার' দিয়ে আসনে বসিয়ে 'জামাতা অর্চ্চন' করার পর কনের মাতা রম্ভা বরণ-কুলা নিয়ে হরষিত মনে জামাতাকে বরণ করেন। এই বরণ-কুলায় বরণের যে-সব সামগ্রী থাকে তার বর্ণনা দিয়েছেন দ্বিজ মাধব:

লক্ষপতি সাধুরে আপনা ধন্য মানি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সাধু জামাতা বাড়ী আনি।।
বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া করিল ভূষণ।
আসনে বৈসাইয়া কৈল জামাতা অর্চ্চন।।
তখনেত রম্ভা রামা বড় কুলা লইয়া।
জামাতা বরয়ে রামা হরষিত হইয়া।।[৭২]

বরযাত্রীসহ বর কনের বাড়ি উপস্থিত হলে কনের মা-বাবা তাদের অভ্যর্থনা জানান এবং বরকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে বিশেষভাবে বরণ করে নেন। এ ছাড়া এয়োস্ত্রীরা বা কনের সখীরা নানা স্ত্রী-আচারের মধ্য দিয়ে বরকে বরণ করে নেয়। এ সব নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃত্যের মধ্য দিয়ে বরকে বরণ করার ফলে এই বরবরণ আচারটি একটি সুমধুর ও স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণতি হয়। আজও আমাদের সমাজে বর বিবাহ উদ্দেশ্যে কনের বাড়ি উপস্থিত হলে তাকে ঘটা করে বরণ করা হয়।

সাতপাক

বাঙালি হিন্দু সমাজের সর্বত্রই সাতপাক অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আনন্দ ও গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বর-কনে প্রথম পরস্পরের কাছাকাছি আসে। বিবাহ-উদ্দেশ্যে বরকনের বাড়িতে বা বিবাহ সভায় উপস্থিত হলে নানা মঙ্গলাচার শেষে বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও আকর্ষণীয় সাতপাক আচারটি পালিত হয়। অনেক সময় সাতপাকের সঙ্গে মালাবদল ও শুভদৃষ্টি আচারটিও যুক্ত থাকে। তবে সাতপাক আচারটি পালনের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও বরকে জলচৌকির ওপর, কোথাও আল্পনাযুক্ত পিঁড়িতে দাঁড় করানো হয়। আবার কোথাও কোথাও বরকে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। অন্যদিকে কনেকে একটি আল্পনাযুক্ত পিঁড়িতে বসিয়ে বিবাহসভায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও কনের মুখ পান দিয়ে ঢাকা থাকে। অতঃপর বরকে দক্ষিণে রেখে কনেকে সাতবার বা সাতপাক ঘোরানো হয়। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ শেষে কোথাও বর-কনে উভয়ের দিকে, কোথাও বা কনে বরের দিকে ফুল ছুঁড়ে দেয়। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে কনে হেঁটে হেঁটেও বরকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। পরে একটি পাতলা চাদর দিয়ে দু'জনের মাথা ঢেকে দেয়া হয়, তখনই তাদের মধ্যে 'শুভদৃষ্টি' বিনিময় হয়। এ সময়ই বর-কনে পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, যাকে আমরা 'মালাবদল' বলি।

মঙ্গলকাব্যেও সাতপাক মঙ্গলাচারটির বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে কবি তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী এই আচারটির বর্ণনা দিয়েছেন।

মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে খুল্লনা-ধনপতির বিবাহে খুল্লনা স্বামীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, 'হরি ধ্বনি' দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দেয় —

স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল।
হরিধ্বনি দিঞা মালা গলে তুলি দিল।।[৭৩]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব-গৌরীর বিবাহে শিবকে প্রদক্ষিণের সময় পান ফেলে নমস্কার জানানোর কথা বলেছেন মুকুন্দরাম। তাছাড়া সাতপাকের অনুষঙ্গ হিসেবে মালা পরানোর কথাও এসেছে —

শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাতবার।
নিছিয়া পেলিল পান কৈল নমস্কার।।
মহেশের গলে গৌরী দিলা রত্নমাল।
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল।।[৭৪]

মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহ অনুষ্ঠানে সাতপাক আচারটি পালনের ক্ষেত্রে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন। 'পাটে চড়ে' সুশীলা তার বরকে প্রদক্ষিণ করে, পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজনদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। এ ছাড়া, মালাবদলের পাশাপাশি সাতপাকের অনুষঙ্গ হিসেবে কবি শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি বিনিময়ের চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন —

পাটে চড়ে রূপবতি প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভক্ষণে দুজনে ছামুনি।
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ দেয় জয়ধ্বনি।।[৭৫]

অভয়ামঙ্গল কাব্যে ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে সাতপাক আচারটি পালনের ক্ষেত্রে খুল্লনা প্রথমেই স্বামীকে নমস্কার জানিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে মালা পরিয়ে দেয়। এ সময় উপস্থিত সবাই 'বেদধ্বনি' উচ্চারণ করে। তারপর অন্যেরাও বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

প্রথমে পতিরে দেখি করে নমস্কার।
সাবধানে প্রদক্ষিণ করে সপ্তবার।।
প্রদক্ষিণ করি রামা মালা দিল গলে।
বেদাচারে বেদধ্বনি সর্ব্বজনে বোলে।।
অন্যে অন্যে পুষ্পমালা দিল শুভক্ষণ।
হেন বুঝি বরবধূ বান্ধে প্রেমগুণ।।[৭৬]

বাঙালি বিবাহে একটি আনন্দময় লোকাচার সাতপাক। অঞ্চলভেদে এই মঙ্গলাচারটি পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিলেও বাঙালি হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিবাহে এটি একটি অনিবার্য এবং আনন্দময় অনুষ্ঠান, যা আমরা মঙ্গলকাব্যগুলোতেও লক্ষ্য করি। বিয়ের বাঁধন সাত কেন হবে এ ক্ষেত্রে দুলাল চৌধুরী বলেছেন, " 'সাত' সংখ্যাটি পবিত্রতাসূচক। অন্তত

ভারতীয় জীবনে ত বটেই।"[৭৭] বিবাহমণ্ডপে কনে কর্তৃক বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার রীতি এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রয়েছে।

কন্যাসম্প্রদান/কন্যাদান

বিবাহ-উদ্দেশ্যে বর কনের বাড়িতে বা বিবাহসভায় উপস্থিত হলে নানা আচার-অনুষ্ঠান শেষে কন্যাসম্প্রদান বা কন্যাদান আচারটি পালিত হয়। অর্থাৎ বরবরণ, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি আচার শেষে নানা কৃত্যের মধ্য দিয়ে কন্যাকে বরের কাছে সম্প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কনের পিতা কিংবা পিতার অবর্তমানে পিতৃস্থানীয় কেউ কন্যাসম্প্রদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। অনেক সময় দেখা যায় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করলে পিতা বা পিতৃস্থানীয় কেউ তা উচ্চারণ করে কন্যার হস্ত বরের হস্তের ওপর স্থাপন করে কন্যাসম্প্রদান করে থাকেন। তবে অঞ্চল ভেদে কন্যাসম্প্রদান আচারটির বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলকাব্যে কন্যাসম্প্রদান আচারটির প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে কনের পিতা শালবান রাজা হাতে তিলকুশ ধরে, পূর্বপুরুষদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ করে, অন্য দিকে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে বাক্য পড়াকালে শালবান রাজা শ্রীমন্তের হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করেন। কন্যাসম্প্রদানকালে রাজা তার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্ধরাজ্য সেই সাথে বস্ত্র, অলঙ্কার, সাতটি নৌকা, এমনকি হাতি, ঘোড়াসহ নানা ধন প্রদান করেন —

শালবান হস্তে ধরিঞা তিলকুশ।
নামগোত্রে উচ্চারিল সপ্ত পুরুষ।।
ব্রাহ্মণে পড়িছে বাক্য বিবিধ বিধান।
শ্রীমন্তকে শালবান কন্যা করে দান।।
আর্দ্ধ রাজ্য দিল দান বস্ত্র অলঙ্কার।
ইষ্ট মিত্র দান করে দেশ ব্যবহার।।
ঘাটতে দিলেন রাজা সপ্তখান না।
মানিক অঙ্গুরি দিল সুশীলার মা।।
হস্তি ঘোড়া নানা ধন রাজা দিল দান।[৭৮]

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহে কনের পিতা সঞ্জয়কেতু আনন্দিত চিত্তে কুশহস্তে কন্যাদান করেন। ব্যাধ জাতির দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য উপকরণ ধনুক। সেই বিবেচনায় সঞ্জয়কেতু যৌতুক হিসেবে ধনুকদানের মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন —

বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু
কুশহস্তে করে কন্যাদান।
যৌতুক ধনুকখান দিল খর তিন বাণ
জামাতারে করিল বহুমান।।

বাজায়্যা ঢেমচা পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটিছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।[৭৯]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে পূর্বপুরুষের পুণ্যের ফলে বর্তমান সুখভোগে বিশ্বাস, এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে আরো একটি লোকাচার পাচ্ছি তা হল নববিবাহিত দম্পতির অরুন্ধতী নক্ষত্রদর্শন। "অরুন্ধতী নক্ষত্র যেমন স্থির হয়ে থাকে তেমনি মনে করা হয় এই দম্পতিও চিরকাল বন্ধনে অটুট থাকবে। অনুষ্ঠানটির রেওয়াজ বর্তমানেও মুছে যায়নি।"[৮০]

কবি মুকুন্দরাম 'ধনপতি উপাখ্যান'-এ ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে খুল্লনার পিতা লক্ষপতি যৌতুকদানসহ কুশহস্তে কন্যাদানের কথা জানাচ্ছেন। সেই সম্প্রদানের অনুষঙ্গ হিসেবে গাঁটছড়া বাঁধা এবং বর-কনের অরুন্ধতী নক্ষত্রদর্শনের উল্লেখ আছে —

অভয়ার ব্রতফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
লক্ষপতি করে কন্যাদান।
শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথগজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামাতারে সাধে মান।।
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।[৮১]

আমরা দেখি প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে কন্যাসম্প্রদানের ধারাবাহিকতায় যৌতুকদানের ব্যাপারটি এসেছে। কনের পিতা কন্যার দাম্পত্য সুখ কামনায় স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী বিবিধ আচার পালনের পাশাপাশি যৌতুকদানেরও চেষ্টা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচুশ্রেণী নির্বিশেষে সবখানেই যৌতুকদানের ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যৌতুকদানের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আস্থার প্রকাশ দেখা যায় দ্বিজ রামদেবের *অভয়ামঙ্গল* এবং দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* কাব্যে। কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহে কন্যাসম্প্রদানকালে কালকেতুকে ভগ্ন নারিকেল এবং পুরনো ধনু যৌতুক দেয়ার চিত্রে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে —

দ্বিজ রামদেব — কৈন্যা সমর্পিয়া যেন মন কুতূহল।
যতুক মিলেক এক ভগ্ন নারিকেল।।[৮২]

দ্বিজ মাধব — সম্প্রদানের বাক্য বিপ্র উচ্চারে বদনে।
দানের সজ্জা আনিয়া দিলেন বিদ্যমানে।।
ভাঙ্গা নারিকেল দিল পুরান ধনুখান।[৮৩]

এখানে যৌতুক হিসেবে ভগ্ন নারিকেল ও পুরাতন ধনু গুরুতর দারিদ্র্যের ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দ্বিজ রামদেব জানাচ্ছেন —

কুশণ্ডিকা বেদাচারে বিপ্র আনল জ্বালে
বেদধ্বনি করে আচম্বিত।

জানাইআ প্রবরগন্ধ কত ছান্দে পরিছন্দ
মন্ত্র উচ্চারে পুরোহিত।।
বরবধূ করস্থলে বান্ধি বিপ্র কুশমূলে
রাখে হেম ঘটের উপর।
সরস পরশ রসে দুই জনে প্রেমে ভাসে
পুলকে প্রবল কলেবর।।
ব্রহ্মপদ মনে করি মহাবাক্য অনুসারি
লক্ষপতি করে কন্যাদান।
যতুক সম্ভার যথ দাস দাসী কত শত
সমর্পিয়া করিল পয়ান।।[৮৪]

অর্থাৎ ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে কন্যাসম্প্রদানকালে কবি আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের কথা জানাচ্ছেন। প্রথমেই তিনি 'কুশণ্ডিকা' আচারটির কথা উল্লেখ করেছেন। কুশণ্ডিকা বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার।

> আনুষ্ঠানিকভাবে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে ভোজ্যাপকরণ (oblations) নিবেদন করার নাম কুশণ্ডিকা, ইহা না হইলে হিন্দুর বিবাহাচার সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হয় না। ইহা সম্প্রদানের পরেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিবাহের রাত্রেই কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠেয়, কিন্তু শেষরাত্রিতে বিবাহের লগ্ন থাকিলে কোন কারণে যদি তাহা রাত্রিমধ্যে নিষ্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে তাহা পর দিবস প্রভাতে অবশ্যই কর্তব্য। এই কুশণ্ডিকা উপলক্ষেই বিবিধ হোম করা হইয়া থাকে। তবে ইহা বিবাহের পর প্রথম দশ দিনের মধ্যে যে-কোন দিন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রীয় বিধান আছে।[৮৫]

অন্য একজন সমালোচকের ভাষায়, "বাঙালী বিবাহের বেশীর ভাগ ও প্রধান শাস্ত্রীয় কাজ অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদানের পরে, বিয়ের রাত্রে বা বিয়ের পরের দিন সকালে। এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা।"[৮৬] কুশণ্ডিকা বলতে সাধারণতঃ বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ, ধ্রুবনক্ষত্র ও অরুন্ধতী দর্শন ইত্যাদি কর্ম বোঝায়।

দ্বিজ রামদেব সম্প্রদানের পূর্বেই কুশণ্ডিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কুশণ্ডিকা ছাড়া, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বেদধ্বনি ও মন্ত্র উচ্চারণ করে বর-কনের হাত হেম ঘটের ওপর স্থাপন করে, ব্রহ্মপদ মনে করে, মহাবাক্য অনুসারে লক্ষপতি তাঁর কন্যাদান করেন। যৌতুক হিসেবে দেন বিস্তর ধন-দৌলত সেই সাথে শত শত দাস-দাসী। এখানে দারিদ্র্য নেই, আছে উচ্চবিত্তের বিলাসিতা। অন্যত্র শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে অর্ধরাজ্যসমেত কন্যাদানের কথাও জানিয়েছেন দ্বিজ রামদেব —

বাখান করিয়া রাজা সম্বিধান কৈল্ল।
অর্দ্ধরাজ্য সমে রাজকন্যাদান দিল।।[৮৭]

মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যে শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে কনের পিতা সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করে দানের সজ্জা সমুখে রাখেন। অতঃপর মন্ত্র শেষে সম্প্রদাতা 'স্বস্তিবাচন' উচ্চারণ করেন। এখানে কবি দ্বিজ মাধব যৌতুক হিসেবে অর্ধরাজ্য দানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইসাথে নানা অলঙ্কার, রজত-কাঞ্চন, শত শত হাতী এমনকি 'সুশীলার সেবনহেতু' পরম রূপসী দুইশত দাসীর কথা জানাচ্ছেন কবি —

সম্প্রদানের মন্ত্র রাজা উচ্চারে বদনে।
দানের সজ্জা নিয়া থুইল বিদ্যামানে।।
মন্ত্র পড়িয়া কৈল স্বস্তিবাচন।
সুশীলা কন্যারে দিল অর্দ্ধরাজ্য ধন।।
ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন।
নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন।।
মদমত্ত হস্তী তারে দিল একশত।
দুই শত হস্তী দিল বৎসসহিত।।
সুশীলা-সেবনহেতু পরম রূপসী।
রত্নে বিভূষিত দিল দুই শত দাসী।।[৮৮]

বাসরঘর/ফুলশয্যা

বাসর হলো বর-বধূর কাঙ্ক্ষিত এবং আনন্দময় স্থান। প্রথম মিলনরাত্রি এবং পরস্পরকে কাছে পাওয়ার প্রথম সুযোগ। বর-বধূ বাসর ঘরে ঢোকার আগে ঘরটিকে ফুল এবং অন্যান্য জিনিস ও সুগন্ধি দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতেই সাজানো হয়। বাসরের পবিত্রতা ও শুভাশুভের কথা চিন্তা করে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। বর-বধূকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মীয়-স্বজনেরা আড়াল থেকে উঁকি দেয় এবং পরদিন ঠাট্টা-পরিহাস করতেও ছাড়ে না। এ ছাড়া কোথাও কোথাও বর-বধূকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, হালকা গান-বাজনারও আয়োজন করে। অনেক সময় বাসরঘরে 'কড়ি' বা 'পাশাখেলা'র আয়োজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে এয়োস্ত্রীরা প্রতিবারই বরকে হারিয়ে কনেকে বিজয়ী করার চেষ্টা করে এবং নতুন বৌকে উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। তবে বাসরঘরে বর এবং বরের ঘনিষ্ঠ দু'একজন বন্ধু ছাড়া পুরুষের প্রবেশাধিকার সাধারণত থাকে না। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাসরঘর ব্যাপারটি বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাসরঘরের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মানিকদত্ত ধনপতি-খুল্লনার বাসরঘরে ক্ষীর ভোজনের কথা বলেছেন—

বিবাহ করিল বালা সাধুর নন্দন।
বাসর ঘরে কৈল খিরস ভোজন।।[৮৯]

মুকুন্দরামের 'কালকেতু উপাখ্যান'-এ কালকেতু-ফুল্লরা 'মীন মাংস' ভোগ করে কুসুমশয্যায় রাত্রিযাপন করে —

দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।[৯০]

অন্যদিকে 'ধনপতি উপাখ্যান'-এ শ্রীমন্ত-সুশীলার বিবাহে কবি 'খীরখণ্ড' ভোজন করে 'ফুল-ঘরে' শয়নের কথা উল্লেখ করেছেন—

ভোজন করিল দোঁহে খিরখণ্ড ঝোলে।
ফুল-ঘরে শোয় সাধু রাজকন্যা কোলে।।[৯১]

বাসরঘর/কুসুমশয্যার বিস্তারিত বিবরণ পাই *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে। সেখানে বাসরঘর অনুষ্ঠানটিতে যে রমণীদের রাজত্ব, তা ছাড়া বর-বধূকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সখীদের আমোদ-প্রমোদ, হাসি-ঠাট্টা, তামাশা ও আড়াল থেকে উঁকি দেয়ার চিত্রটি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে —

চৌদিকে রঙ্গিণী মেলা জুআএ করিআ খেলা
কর্ম্ম সাঙ্গে করিলা ভোজন।
সাধু কুসুমশয়ন ধরি উড়াইয়া মধুকরী
হরষিতে করিল শয়ন।।
কৈন্যা লইয়া সখী আইসে শোয়াএ সাধুর পাশে
অখণ্ড রাখিল দীপশিখা।
গবাক্ষেত দিআ আখি ঝুকি দেখে কত সখী
যেন করিমুখে কমলকলিকা।।[৯২]

বাঙালির বিবাহে এক আনন্দময় অনুষ্ঠান বাসরঘর সংক্রান্ত আচার এবং ফুলশয্যা। বিবাহের পর বর ও বধূর প্রথম একত্র শয়নরূপ আচারকে বলে ফুলশয্যা। সাধারণত বিবাহের তৃতীয় রাত্রিকে ফুলশয্যা বা কুসুমশয্যার রাত্রি বা শুভরাত্রি বলা হয়। বাংলার প্রায় সর্বত্রই এই আচার পালিত হয়। এই উপলক্ষে বাসরঘর ও শয্যাকে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। এখান থেকেই বর-বধূর একত্রে বসবাস শুরু হয় অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন বা সংসারজীবন শুরু হয়।

বধূবরণ বা বৌ পরিচয়

বর কনেকে সঙ্গে করে স্বগৃহে পৌঁছালে তাকে সস্নেহ সসম্মানে বরণ করে নেয়ার আচারটির নাম বধূবরণ, বউবরণ বা বৌ পরিচয়। শ্বশুরালয়ে প্রথম বউয়ের মুখ দেখার এই লৌকিক আচারটিকে কোথাও কোথাও 'বউগড়া'ও বলা হয়ে থাকে। বর যখন নবধূকে নিয়ে নিজগৃহে পৌঁছায়, তখন তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এবং নববধূকে দেখার আগ্রহে পাড়াপড়শীরা ভিড় জমায়। এ সময় শাঁখ বাজে, উলু দেয়, গীত গায় অর্থাৎ কোলাহল-আনন্দে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। বধূবরণের আচারটি সর্বত্র এককরম নয়। কোনো

কোনো স্থানে নববধূ পতিগৃহে প্রবেশের সময় উঠানে একটি আল্পনাযুক্ত স্থানে থালায় দুধভাত, কাঁখে কলস, মাথায় ধানের রেক্ বা কুন্‌কে, হাতে একটি ছোট মাছ বা মাছের ডালা নিয়ে দাঁড়ায়। আলতা বা লাল রঙ মিশিয়ে দুধের রং লাল করা হয়। অতঃপর মাতা বা মাতৃস্থানীয় কেউ অন্য এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে করে বরণডালায় সজ্জিত মঙ্গলদ্রব্যাদি দ্বারা বর-বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় বর-বধূর পেছন পেছন হাতের জাঁতি দিয়ে বধূর মাথায় ধান, অল্প অল্প করে ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যায়। কোথাও কোথাও কাঁখে কলসী, মাথায় ডালা দেওয়া হয় এবং চারিদিকে খই, চাল বা কলা ছড়ানো হয়। এ থেকে কোলে-কাঁখে সংসার উথলানোর ভবিষ্যৎ ছবি কল্পনা করা হয়। এরপর একে একে অনেকে এসে যৌতুক/উপহার দিয়ে নববধূর মুখ দেখে। এ সময় বউ গিয়ে শাশুড়িকে প্রণাম করলে শাশুড়ি আশীর্বাদ করে পুত্রবর দেন এবং সাথে আংটি বা অন্যকোনো অলঙ্কার উপহার দেন। কোথাও আবার ধান-দূর্বা দিয়ে পিঁড়িতে বসিয়ে বউকে বরণ করা হয়।

> এইরূপ প্রথাও দেখা যায় — বরণ স্থানের সম্মুখে, প্রবেশ পথে কেহ একটি পাত্রে দুধ জ্বাল দিতে থাকে এবং যখন উথলাইয়া পড়ে বধূকে জিজ্ঞাসা করা হয় — কি দেখিতেছ? সে উত্তর দেয় সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। বরণের পর নবধূকে রান্নাঘরে লইয়া হাঁড়ি-ভর্তি এবং হাঁড়ি ঢালা ভাত দেখাইবার প্রথাও কোনও কোনও সমাজে আছে। বধূ যে সচ্ছল সংসারে আসিয়াছে, এ সংসারে যে ভাত ফেলিয়া ভাত খায়, বধূর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই হয়তো এককালে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।[৯৩]

মঙ্গলকাব্যগুলোতে বধূবরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই বরণের ক্ষেত্রে কাব্যভেদে ভিন্নতা দেখা যায়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্ত-জয়াবতীকে সঙ্গে করে নিজঘরে পদার্পণ করলে শাশুড়ি খুল্লনা হরষিত চিত্তে পুত্রবধূকে বরণ করে নেয় —

> বিবাহ করিঞা জদি শ্রীমন্ত আইল।
> পুত্রবধূ দেখি রামা হরসিত হৈল।।
> ধন্য ধন্য বলে রামা পুত্র দেখিঞা।
> পুত্রবধূ খুলনা লইল আলচিঞা।।[৯৪]

আমরা দেখি বিবাহের একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। মৌল উদ্দেশ্য সমাজস্বীকৃত দেহমিলন ছাড়াও সন্তান লাভ, একই গৃহে বসবাস, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি। বিবাহের মাধ্যমে যেন সুখ-শান্তি আসে এবং সে শান্তি চিরস্থায়ী হয়, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্নভাবে বিবাহের রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। সেই সাথে পালিত হয় সামাজিক, ধর্মীয় এবং আইনগত বিধিবিধান।

> বিবাহকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার জন্য বিভিন্ন আচার-আচরণের আমদানি হয়েছে। এই আচার-আচরণ ও রীতিনীতির মারফৎ অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা অশরীরী দেবদেবীকে সাক্ষী মানা হয় বিবাহিত জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, সুখী করতে, সমৃদ্ধিশালী করতে। বিবাহবন্ধনকে

> সুখী ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য ভূত-প্রেত, ডাইনী, নাগাদি অপদেবতাদের উৎপাত আশঙ্কা করে এবং তা বন্ধ করতে নানাপ্রকার নাচ-গান ও বাজনার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া নানাবিধ জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস থেকে প্রতিপালিত হয় বিভিন্ন স্ত্রী-আচার, তুকতাক প্রভৃতি। প্রীতিভোজ মারফৎ বিবাহকে দেওয়া হয় সমাজ-আইনের স্বীকৃতি। বিবাহকে কেন্দ্র করে পরিবার ও সমাজ এগিয়ে যায়।[৯৫]

বিবাহ একটি সংস্কার, এর কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় আর কিছু লৌকিক মেয়েলি-আচার। সমাজ, সম্প্রদায় ও স্থানভেদে শাস্ত্রীয় অংশে শাস্ত্রশাসিত সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি মিল থাকলেও লৌকিক অংশে নানারূপ পার্থক্য দেখা যায়। কারণ স্থান ও পাত্রভেদে জীবনাচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক চিন্তা-চেতনার ফলে বিবাহাচার পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, যা আমরা মঙ্গলকাব্যগুলোতে দেখে এসেছি।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিবাহাচার সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত —

> কেবলমাত্র দেশের রাজনৈতিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতে পারে না — দেশের সাধারণ মানুষের অতীত পরিচয় যদি ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রকাশ না পায়, তবে সাধারণ মানুষও সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল অনুভব করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশের ইতিহাসের কেবলমাত্র শিক্ষাগত (academic) মূল্য ব্যতীত আর কোনও মূল্য নাই। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের এই ত্রুটি দূর করিবার পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলি যে পরম সহায়ক হইতে পারে, ইহাদের বিবাহাচারের বর্ণনাগুলিই তাহার প্রমাণ। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিবাহাচারের বর্ণনাগুলি বাংলার সর্বত্র অভিন্ন নহে — ইহার অর্থ মঙ্গলকাব্যের মৌলিক কাহিনী সম্পর্কে সর্বত্র অভিন্নতা রক্ষা করা হইলেও, ইহার বহিরঙ্গগত বিস্তৃত (details) পরিচয়ের ভিতর দিয়া বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্র রক্ষা করা হইয়াছে। কবিগণ নিজস্ব সমাজের মধ্যে যে সকল বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই উপকরণ তাহাদের কাব্য-রচনারও উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বিষয়ে প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন — সেইজন্য যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[৯৬]

পরিশেষে বলা যায়, মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিবাহ সংক্রান্ত বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তথা লোকসংস্কৃতি থেকে উক্ত সময়ের মানুষের জীবনাচরণকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। মূলত লোকসংস্কৃতি একটা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। সংহত সমাজমানস এতে বিবৃত। লোকসংস্কৃতি কখনও কখনও লৌকিক ধর্মের অঙ্গস্বরূপ। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে সমাজজীবন লোকাচার শাসিত। মঙ্গলকাব্যে বিয়ে প্রসঙ্গে লোকাচারের ব্যাপক পরিচয় এ প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে। তাই মানুষের জীবন প্রবাহে ধর্মের মৌলিক বিধান ছাড়াও লৌকিক আচার-আচরণের সুদৃঢ় বন্ধন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি।

তথ্যনির্দেশ

1. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি-কথা*, ষষ্ঠ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪, পৃ.১
2. উদ্ধৃত, কার্তিকচন্দ্র শাসমল, *সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান*, চতুর্থ সংস্করণ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯৯, পৃ.৭৭
3. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭
4. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭
5. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.১৪৭
6. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল* 'কালকেতু উপাখ্যান', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ.২৮৫
7. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬
8. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬
9. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২
10. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫, পৃ.৪২
11. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২
12. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
13. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১
14. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩১
15. আশুতোষ দাস (সম্পা.), দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ.১২৯
16. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩১
17. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০
18. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
19. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২০
20. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৭
21. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩-৩৪
22. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪
23. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০
24. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২১
25. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮
26. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
27. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৪
28. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬
29. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫
30. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২০
31. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

32. Crooke, *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, 1984, Allahabad Edition, পৃ. ২০১, [তথ্য: সনৎকুমার নস্কর, *মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.১৪৩]
33. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬
34. সুনীলকুমার ওঝা (সম্পা.), মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪, পৃ.২১২
35. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭
36. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩
37. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭
38. সুভাষ মিস্ত্রী, 'বিবাহগীতি', দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.১৬৯
39. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২১
40. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮
41. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
42. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১
43. সাধনা চৌধুরী, 'চোরপাণি', *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫
44. মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬
45. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২১
46. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
47. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২
48. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪-১৩৫
49. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৮
50. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭-৩৮
51. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮
52. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬-১৩৭
53. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯
54. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
55. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩
56. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯
57. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮
58. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩
59. *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
60. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০
61. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৬
62. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১
63. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২
64. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫
65. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১
66. শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালী জীবনে বিবাহ*, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ.৪৮১-৪৮২

67. কামিনীকুমার রায়, 'হিন্দু বিবাহে লোকাচার', দীনন্দ্রেকুমার (সম্পা.), *বিবাহের লোকাচার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.৭৪-৭৫
68. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২২২
69. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯
70. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯
71. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯
72. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯
73. মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯
74. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
75. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫
76. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
77. দুলাল চৌধুরী, 'বাঙালীর বিবাহাচার : সংস্কার না বিজ্ঞান', *বিবাহের লোকাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১
78. মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭-৩৫৮
79. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০
80. রীতা বসু, 'বাংলা সাহিত্যে বিবাহের লোকাচার প্রসঙ্গ', *বিবাহের লোকাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭
81. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৪০
82. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১
83. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩
84. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১
85. বাইশ কবির *মনসা-মঙ্গল* বা *বাইশা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩
86. শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালী জীবনে বিবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯
87. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০
88. দ্বিজ মাধব, *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১০
89. মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১০
90. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'কালকেতু উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০
91. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, 'ধনপতি উপাখ্যান', প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৬
92. দ্বিজ রামদেব, *অভয়ামঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩
93. কামিনী রায়, 'হিন্দু বিবাহে লোকাচার', *বিবাহের লোকাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
94. মানিকদত্ত, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৭
95. শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালী জীবনে বিবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭
96. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, ষষ্ঠ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ.৩৪-৩৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

সুন্দরবনের লোকজীবন ও সমাজ-পরিচিতি

প্রণব কুমার রায়*

সার সংক্ষেপ

সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়সহ তাদের আছে সামাজিক পরিচিতি। তারা এদেশের আদিম জনগোষ্ঠী। তবে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী বলতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝায়। তারাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ অনাবাদী এলাকাকে আবাদযোগ্য ও মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে। এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও এখানে রয়েছে মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আবার সৎপুরী, ধুলিয়াপুরী, বাজতপুরী ও নুরনগর সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় রয়েছে নির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও সমাজ-বন্ধন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়মকানুন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে সমাজপতির ভূমিকা ও মূল্যায়ন বেশি। এসব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাস করে ঋষি ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। মুণ্ডাদের রয়েছে নিজস্ব প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান। এ ছাড়া সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বাওয়ালী, মৌয়ালী, চুনারু ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী। জঙ্গলে অবস্থান কালে এ-সব পেশাজীবী সম্প্রদায়ের রয়েছে নির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও আচারক্রিয়া। সুন্দরবনের মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনাচরণ ও সামাজিক ক্রিয়াপদ্ধতি স্ব-স্ব মহিমায় ভাস্বর।

সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে নমশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় প্রধান। তফসীল জাতি হিন্দুর মধ্যে নমশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই এই ভূমির আদিম অধিবাসী। নৃতাত্ত্বিকভাবে বলা যায় সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষ অনার্য। দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয়ান জাতির (race) সংমিশ্রণ। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার ১৮৭৫ সালে লিখেছেন যে, খুলনা জেলার সকল অধিবাসী বাঙালী এবং বেদে যারা শিকারী নামে পরিচিত তাদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী। মূলত বাঙালী জাতি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে পরিপুষ্ট। তাই নৃতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায়, বাঙালী রক্তে নেগ্রিটো[১] বা নেগ্রিবুট,[২] অস্ট্রিক[৩] বা আদি অস্ট্রেলিয়া[৪] বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড[৫] (ভেড্ডিড), দ্রাবিড়,[৬] মঙ্গোলীয়,[৭] আলপাইন,[৮] নর্ডিক[৯] প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান। নৃতাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠি নির্ণয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়

* ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জয়নগর ইয়ার আলী খান ডিগ্রী কলেজ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

তা হলো– ভাষার সাদৃশ্য, মানবদেহের গঠন প্রণালী ও তার বাহ্যিক অবয়ব, যথা: মাথা, কপাল, নাকের আকৃতি-প্রকৃতি, চোখের রং ও চুলের বৈশিষ্ট্য।[১০]

সুন্দরবনের মানুষ যেহেতু এ দেশের আদিম জনগোষ্ঠী, তাই কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক মনে করেন তাদের ওপর সর্বপ্রথম নেগ্রিটোদের প্রভাব পড়েছিল।[১১] এদের চুল ঘন কোঁকড়ানো, গায়ের রং কালো, ঠোঁট পুরু ও ওলটানো, নাক মোটা ও চেপ্টা, দেহ খর্বাকৃতির।[১২] নেগ্রিটোদের দেহ গঠনের সঙ্গে মালয় উপদ্বীপের সেমাং জাতির সাদৃশ্য রয়েছে।[১৩] এক সময় এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েছিল।[১৪] বর্তমানে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ে, ময়মনসিংহের পার্বত্য অঞ্চলে এ ধরনের চেহারার লোক পাওয়া যায়।[১৫]

অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, বাংলার আদিম অধিবাসীর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল অস্ট্রিকদের।[১৬] এদের রং কালো, মাথা লম্বা, নাক প্রশস্ত, চুল তামাটে, দেহের গঠন খর্বাকৃতির।[১৭] বর্তমানে বাংলার বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোঁড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতির সঙ্গে অস্ট্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়।[১৮] বাংলায় বসবাসরত নমশূদ্র, পোদ, বাইড়ি, বাগদী, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যে এমনকি বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের মধ্যে এদের প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন।[১৯] অনেকে তাই অস্ট্রিকদের 'নিষাদ[জাতি'২০] বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে, নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালীর সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও সকলে এ বিষয়ে একমত যে, প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে বাঙালী এক সঙ্কর জনসমষ্টি।[২১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় ভারতবর্ষে বহুজাতি মিশ্রণ সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। কথাটি বাঙালীর জন সাংকর্য সম্পর্কে প্রযোজ্য:

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক-হুণ-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।[২২]

নৃতাত্ত্বিক হার্বার্ট রিজলে তাঁর *The People of India*, 1908-এ উল্লেখ করেছেন যে, বাঙালীরা মঙ্গল ও দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। কিন্তু বাঙালী নৃতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর *The*

Indo Aryan Races, 1916 পুস্তকে এই মতের বিপক্ষে বলেছেন। ড. হারুন-উর-রশিদ তাঁর *Geography of Bangladesh*-এ উল্লেখ করেছেন অনেকের মতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত প্রটো অষ্ট্রালয়েডরা বাঙালীদের পূর্বপুরুষ। তাদের প্রভাবে এই অঞ্চল (বঙ্গ) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কৃষিকাজ প্রসার লাভ করে। তাঁদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে তারা বাংলা ভাষায় লাঙ্গল, নারিকেল, জোয়াল প্রভৃতি অনার্য অষ্ট্রিক শব্দের উল্লেখ করেন।

অষ্ট্রিকদের একাংশ পুণ্ড্ররা কবে বা কখন গঙ্গার তীর বেয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিল তার তথ্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও বৈদিক যুগে যে পুণ্ড্র ও বঙ্গের অস্তিত্ব ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। মহর্ষি সুদেষ্ণার গর্ভজাত বলিরাজের পাঁচ পুত্রের নাম– অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পাঁচ সন্তানের নামে ৫টি বিখ্যাত দেশের নাম হয়। রামায়ণের পুণ্ড্ররা বর্তমান মালদহ, রাজশাহী ও বগুড়ায় খুব প্রভাবশালী ছিল। সুগ্রীব বাহিনী যখন রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতার সন্ধানে যাত্রা করে তখন বলা হয় পূর্ব দিকের পুণ্ড্ররা তাদের বন্ধু। অর্থাৎ সে সময়েও পুণ্ড্রদের অস্তিত্ব ছিল। তবে সেই পুণ্ড্ররা আজ আর সেখানে নেই– সেটা নিশ্চিত। তারা তাদের আদি নিবাস থেকে 'হাল কর্ষণ' করতে করতে দক্ষিণে সুন্দরবনের প্রান্তে এসে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, পৌণ্ড্র নামক দেশ বা জাতিবাচক শব্দ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর উৎপত্তি। এরা সুপ্রাচীনকালে উত্তর বঙ্গের অধিবাসী ছিল। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে এই অঞ্চলে এসে বসবাস করে এবং বন্য জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই এখনো তাদের পদবীতে বাঘ, হাতী, বক, কাক, শিকারী, বেজী, কয়াল, রপ্তান, মাঝি প্রভৃতি দেখা যায়। তাদের দান সুন্দরবনে যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।[২৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার তাগিদে সবকিছু মানিয়ে নেয়ার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। ১৭৭০ সালে কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলের সময় থেকে যখন বন কেটে আবাদ শুরু হয় তারও বহু পূর্ব থেকে এখানে হিন্দু তফসীলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাস শুরু হয়। এরাই সুন্দরবনের আদি অধিবাসী।[২৪]

উল্লেখ্য, দক্ষিণ বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ধর্মান্তরকরণের মূলে পীর, গাজীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এসব পীর, গাজী আউলিয়াদের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন বর্ণহিন্দু ও সামন্ত প্রভুদের শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাই বিপদ সংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে অসহায় দরিদ্র মানুষেরা তাদের

দৈনন্দিন কর্মজীবনে পীর সাহেবদের সাহায্য পেয়েছেন। এ কারণে পীর-দরবেশরা এ অঞ্চলের মানুষের মনে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। সুন্দরবনাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ ধর্মভীরু হলেও তারা নিজেদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আবদ্ধ রাখেননি। বরং বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই বনবিবি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বহু হিন্দুর আরাধ্য দেবী, আবার দক্ষিণ রায়ের অগণিত মুসলমান ভক্ত রয়েছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে-মানুষে এ ধরনের ঐক্য ও সম্প্রীতি সুন্দরবনাঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

সুন্দরবনাঞ্চলের আদি অধিবাসী বলতে প্রধানতঃ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে বুঝায়। তারাই এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী। আবাদ শুরু থেকে জঙ্গল কেটে নদীতে বাঁধ দিয়ে অনাবাদী জমি তারাই আবাদযোগ্য এবং বসবাস উপযোগী করে তুলেছে। এ বিষয়ে Khulna District Gazetteer-এ উল্লেখ আছে–

> This appears to be due to the fact that the Muhammadans make but few proselytes, though some Hindus may here and there lose caste and adopt the religion of Islam, and to the fact a large proportion of the Hindus consist of casts of aboriginal descent much as the chandals and the Pods who are extremely hardy industrious and thrifty.[২৫]

তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমশূদ্র এই দুই শ্রেণীর সম্প্রদায় বেশি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের মধ্যে সৎপুরী, ধুলিয়াপুরী, বাজতপুরী ও নূরনগর সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আর আছে মুসলমান সম্প্রদায়। এখানে যে-সব মুসলমান বাস করে তারা মূলতঃ ধর্মান্তরিত। অনেকে জাতিচ্যুত হয়ে বা ইসলামের মহান ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বৈবাহিক কারণে এবং ধর্মান্তর হওয়ার ফলে এদের অনেকেই দেশীয় হিন্দুর বংশধর বা মাতৃসূত্রে বাঙালী হিন্দুর রক্তে পুষ্ট।[২৬]

খ্রীস্টান: খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ সুন্দরবনাঞ্চলের দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, শরণখোলা, মোংলা প্রভৃতি উপজেলায় দেখা যায়। এসব সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পূর্ণ ধর্মান্তরিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লোকজন খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। প্রথমে তাদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান কার্যালয় ছিল যশোরে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মযাজক এখানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনাঞ্চলে আগমন করতেন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা খুলনাতে নতুন অফিস স্থাপন করেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৮১৭ সালের প্রথম দিকে যে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী সুন্দরবন এলাকায় কদমদী প্রথমে এসেছিলেন তিনি ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারী। খুলনা থেকে ২১ কি.মি. দক্ষিণে ভরসাপুর নামক স্থানে তিনি প্রথমে এসেছিলেন।[২৭]

১৮৫৬ সালে পিমে সম্প্রদায়ের মনসিনিয়র আন্তনীয় মারিয়েত্তি মালগাজীতে ক্যাথলিক চার্চের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালের ১৭ই মে শেলাবুনিয়ার পিটার পিতাম্বর সরদার ও তার পুত্র প্রথম খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন।[২৮] আর বিশপ দান্তে বাত্তাগ্লিয়েরীন কর্তৃক কালিনগরে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ৭১ জন ব্যক্তি ১৯৬২ সালের ২৮শে জানুয়ারি খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষাস্নাত হয়।[২৮ক]

প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ঋগ্বেদের আমলে বঙ্গদেশের প্রায় অঞ্চল জলমগ্ন ছিল, শুক্ল যজুর্বেদের যুগেও গণ্ডকী নদীর পূর্ব প্রান্তও সমুদ্র সদৃশ ছিল। পাণিনির পাতঞ্জলি মহাভাষ্যেও ভারতবর্ষের (আর্যাবর্তের) সীমানা নির্ধারণ করতে যেয়ে কালক বনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কালক বনকে সুন্দরবন নামে ধারণা করা হয়।[২৯]

সুন্দরবন বরাবরই হিংস্র পশু জীবজন্তু এবং ভয়সংকুল পরিবেশ। তবু ভয়কে জয় করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মানুষ প্রাচীনকাল থেকে সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় খানজাহান আলী, ঈশা খাঁ এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়কাল থেকে অরণ্যময় সুন্দরবন আবাদ করে লোক বসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয়। বার বার অবনমন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনাঞ্চল হয়েছে বার বার বিধ্বস্ত। কিন্তু মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং অনমনীয় মনোবলের কারণে এখানে বসতি স্থাপনের কাজে স্থবিরতা আসেনি।

সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে আবাদ সৃষ্টি এবং বসবাসযোগ্য করার লক্ষে বিহারের রাঁচি, ছোট নাগপুর, হাজারীবাগ, মহারাষ্ট্রের রাজপুতদের এখানে আগমন ঘটে। চব্বিশ পরগণা জেলার সাঁওতালেরা প্রায় সবই হাজারীবাগ থেকে এসেছে বলে গ্রীয়ারসন মন্তব্য করেছেন। তবে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত লোক এ অঞ্চলে বেশি বাস করে। পৌণ্ড্রনামক জাতিবাচক শব্দ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর উৎপত্তি। এদের আদিবাস উত্তরবঙ্গে।[৩০] মি ফকাস সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাসকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমশূদ্রদের আদিম জাতির (aboriginal descent) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এদের ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে এ দেশে তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে তুলেছে। মহাভারতের আদি ও শান্তি পর্বে ও শ্রীমদ্ভাগবতে অনার্য পৌণ্ড্রদের কথা উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে, বল্লাল সেন কৌলীন্য বিতরণের সময় এই দুই জাতিকে আহ্বান করেন। তারা বল্লালের মনোভাব বুঝতে পেরে তার সাথে অসহযোগিতা করে। ফলে গৌড় থেকে সরে এসে তারা ক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের সর্বত্র যেমন– যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপন করে। Khulna District Gazetteer-এ এ বিষয়ে উল্লেখ আছে–

> ... and to the fact a large proportion of the Hindus consist of castes of aboriginal descent, such as the chandals and the Pods, who are extremely hardy industrious, and thrifty. While their habits which are almost amphibious.[৩১]

নমশূদ্র সমাজের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির প্রাবল্য দেখা যায় তবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের লোকেরা অতীব নিরীহ। বল্লাল সেন কায়স্থ এবং অন্যান্য কয়েকটি জাতির মধ্যে কৌলীন্য প্রদান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা দেশের সর্বেসর্বা ছিলেন। কৌলীন্য দানের মাপকাঠি হিসেবে তারা চারিত্রিক গুণাবলী ও বিদ্যাবুদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতেন।

এ বিষয়ে শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ মতামত প্রকাশ করেন যে, অনার্য পৌণ্ড্রগণ দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এবং তারা অন্ধ্র ও পুলিন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত। এ দেশের পৌণ্ড্রগণ রাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও ওড্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁর মতে আর্য পৌণ্ড্রগণ পরশুরামের অত্যাচারে ভীত হয়ে আত্মগোপন করে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সময় তাদের ধর্ম গ্রহণ করে। পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা ব্রাহ্মণদের কোপানলে পড়ে এবং শূদ্র জাতির ন্যায় ব্যবহার পেতে থাকে। এ-সময় পৌণ্ড্রগণ ভ্রাতৃক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হয়।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে আবার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। যথা– সৎপুরী, ধুলিয়াপুরী, বাজপুরী ও নূরনগর সম্প্রদায়। এ নামগুলি স্থান নামের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– সোদপুর, পরগণা থেকে সৎপুরী, ধুলিয়ান বেগের নামানুসারে ধুলিয়াপুর ইত্যাদি।

তবে নামগত পার্থক্য থাকলেও এ-সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন– বিবাহ, পূর্বে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু বর্তমানে পূর্বের নিয়মকানুন অনেকটা শিথিল হওয়ায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে বিবাহ কর্ম সমাধা হচ্ছে। একই ব্রাহ্মণ নাপিত পূজার্চনা বা শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করছে। তবে যে পার্থক্যটা লক্ষণীয় তা হলো ভাষাগত। যেমন:

	নমশূদ্র ও সৎপুরী	ধুলিয়াপুরী
কোথায় যাচ্ছ-	কনে যাচ্ছো	কোনে যাচ্ছো
ধান কেমন হয়েছে-	ধান কেমন হয়চে	ধান কিরাম হয়েছে
কি হয়েছে-	কি অয়ছে	কি হুয়েছে
দেবো-	দেবানে	দ্যাবোন৩২

উল্লিখিত পার্থক্য স্থানিক হওয়া অধিক যুক্তিসংগত। বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্বে তাদের মধ্যে বিবাহ চলত না বা সামাজিকভাবে খাওয়া-দাওয়া ছিল না, সামাজিক ক্রিয়া কর্ম চলত না, একই ব্রাহ্মণ দিয়ে তাদের কাজ চলতো।

মূলতঃ বাঙালী হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণী, উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্ণবাদের এই ধারা চলে আসছে। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নমশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক ছাড়াও ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। তাদের সমাজ ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজে তারা অন্ত্যজ নামে পরিচিত। বস্তুতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি আর্য-কৃষ্টিও সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে দীর্ঘদিন সংগ্রামের অবসানে যে-সব অনার্য পরাজিত হয়ে দাসত্ব বরণ করেছিল তারা শূদ্ররূপে আখ্যায়িত হয়।[৩৩] শূদ্রদের সাথে আর্যদের মেলামেশা বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো না। এর ফলে সমাজে জন্ম নেয় 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তা'। এই শূদ্রদের মধ্যে যারা অধম, বর্বর, নিচ শ্রেণীর তারা অন্ত্যজ নামে পরিচিত। আর্যরা যেখানে বাস করত তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।[৩৪]

ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ সুন্দরবনাঞ্চলে সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণীর। তারা গ্রামে বাস করে না, বরং গ্রামের বাইরে নদীর তীরে বসবাস করে। বাংলা ভাষায় তাদের 'মুচি' বলে। মুচি বলতে জুতার কারিগর এবং তারা চামড়ার কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা বিভিন্ন পূজা, পার্বণ-উৎসবাদিতে বাজনা বাজায়, বাঁশের ঝুড়ি, ঝাঁকা তৈরি করে, জাল বোনে।

শ্যামনগরের কৈখালী, কয়রার হরিহরপুর, দাকোপের কালিনগর, বাজুয়া, ত্রিমোহনী, চৌমুহনী ঢাংমারী, বানীশান্তা, চালনা এবং মোংলার শেলাবুনিয়ায় এ ধরনের ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। চামড়া কাটে বলে কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তাদের অংশগ্রহণ নেই। তবে ইদানীং এ অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিকতার ছোঁয়া এবং শিক্ষা প্রসারের ফলে তাদের মৌলিক পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও তারা অনেকটা ভাসমান; তাদের স্থায়ী কোন জমি-জমা নেই তবু তাদের চালচলন, আচার আচরণ এখন পরিশীলিত ও মার্জিত। লবণাক্ততার কারণে গৃহপালিত পশু অপর্যাপ্ততার ফলে তাদের পেশারও পরিবর্তন ঘটেছে।

ঋষি সম্প্রদায়ের অনেকেই খ্রীস্টান মিশনারীদের সান্নিধ্যে এসে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। মিশনারীরা তাদের শিক্ষা, পানীয় জল এবং নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়ার ফলে অনেকেই আজ ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে ঋষি সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা বাংলায় আসতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্ণের ন্যায় সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান ও দেশজ এই পঞ্চ গোত্র মিলে বাংলার মুসলিম সমাজ গঠিত ছিল। তবে প্রথম চারটি শ্রেণী বহিরাগত। তাদের আগমন রাজকর্মচারী, শাসক, সৈনিক বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে। তারা ভাগ্যান্বেষণে জমিদারী জায়গীরদারী ও লাখেরাজ ভূসম্পত্তি

প্রাপ্তির আশায় বাগদাদ, বোখারা, সমরখন্দ ও বসরা থেকে দলে দলে বাংলায় আগমন করতে থাকে। বংশ গরিমার অহমিকায় তারা দেশজ মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্য বলে ভাবতেন এবং মেশার অযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু দেশজ কুলীন হিন্দু সমাজের বংশগত আভিজাত্যের সাথে তাদের বেশ মিল পরিলক্ষিত হয়।

বাঙালী মুসলমান বৈবাহিকসূত্রে এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে অনেকেই দেশীয় হিন্দুর বংশধর অথবা মাতৃসূত্রে বাঙালী হিন্দুর রক্তে পরিপুষ্ট। সে-কারণে বলা যায় সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানরা অধিকাংশই ধর্মান্তরিত। এ বিষয়ে Khulna District Gazetteer এ বর্ণিত আছে- It is true that a large proportion of the Mussalmans also are descendants of the converted chandals Pods.[৩৫]

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ম-নীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণা এলাকা শতবর্ষ বা তৎপূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। মানুষের কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগের ফলে এখানে বসতি স্থাপন সম্ভব হয়েছে। যখন পুরোপুরি সরকারি আইন বা প্রশাসনিক নিয়ম কানুন প্রবর্তন হয়নি তখন এখানে সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তখন সমাজ ব্যবস্থা ও অনুশাসন খুবই দৃঢ় ছিল। সমাজে কেউ অন্যায় বা অসামাজিক কাজ করলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তখন সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা সামাজিক বৈঠকের মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধা করতেন। তখন সমাজে দণ্ডবিধি, বয়কট প্রথা, বিবাদ মীমাংসা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আদান-প্রদান, সমাজ বিভাগ ও বিচার প্রথা, সমাজপতির কর্তব্য, বিরুদ্ধ মতের সমাধান, শ্রাদ্ধের নিয়মকানুন, যাচাই প্রথা, মান মর্যাদা, ভোজন দক্ষিণা সমস্ত কিছুর সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনে আজও এসবের অনেক কিছু টিকে আছে।[৩৬]

পশ্চিমবঙ্গের কালিন্দী নদীর পূর্ব পার হতে দাকোপ থানার পশর নদীর পূর্ব পার চিলা ৫ পাই মৌজা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে নূরনগর, ধুলিয়াপুর, আদি মধ্যম, ভালকো, জামিরা সমাজ পরগণা অবস্থিত। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে অজন্মাহেতু দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বহুজন স্বভূমি পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণের দায়ে শিবসা নদীর পূর্ব পারে বন কেটে আবাদ শুরু করে। আবাদ শেষে বসতি স্থাপনের পাশাপাশি সমাজবেত্তা মনীষীগণ নূরনগর, ধুলিয়াপুর, জামিরা ও মধ্যম পরগণায় মিলিত হয়ে নব গঠিত সমাজ আহ্বান করেন। কালক্রমে এ অঞ্চল সাহস পরগণা নামে পরিচিতি লাভ করে।

সমাজ শব্দের অর্থ একতাবদ্ধভাবে বা একত্রিতভাবে একসঙ্গে মিলিত শক্তি। সম+অজ+ঘঙ-ভাবে সমাজ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। মানুষ সমাজে একাকী বাস করতে পারে না। পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতির ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সমাজে যে কেউ স্বেচ্ছাচারীভাবে চলাচল করতে পারে না। সুন্দরবনাঞ্চলে মানুষ মনে করেন, এই সামাজিক

শাসনবিধি চিরস্থায়ী রাখার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া আইন প্রণয়ন করেছিলেন যে, কোন জাতি বা ধর্মের ওপর রাজদণ্ড দেয়া হবে না। তবে দশজনের বিচার বা শাস্তি মেনে নিতে হবে। আজও কোর্টে এ সামাজিক বিচার অগ্রাহ্য হয় না। সুতরাং, দশজনের মিলিত শক্তির নাম সমাজ। সুন্দরবনাঞ্চলে এই পৌণ্ডুক্ষত্রিয় সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনকালে একটি বিশেষ স্থানে অনুমোদক মণ্ডলী থাকে।

সমাজব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সমাজপতিরা মনে করেন যে, বিশাল রাষ্ট্রীয় শাসন কার্যে যেমন জেলা, মহকুমা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রভৃতি বৃহৎ হতে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত রয়েছে তেমনি সমাজ বিভাগ ব্যবস্থাও রয়েছে। মূল ষোলআনা সমাজ আবার মহকুমার ন্যায় ডিহি বিভাগ করা হয়। তারপর ঐ সমাজের ডিহি আবার তিন আনা, দুই আনা প্রভৃতি মৌজায় পরিণত করা হয়। এরপর ঐ সকল মৌজা আবার এক আনা, তিন পয়সা, ১০ পয়সা, ১ পয়সা প্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশে ইউনিয়নের মত বিভাগ করা হয়।[৩৭] এই অতি ক্ষুদ্র অংশকে ভদ্রাসন বা নিত্যসমাজ বলা হয়। মূল ষোলআনা সমাজ হতে আরম্ভ করে প্রতি ডিহি মৌজা ও নিত্য সমাজের যোগ্যতা ও বংশ মর্যাদা অনুসারে একজন বা একাধিক সম পর্যায়ের লোক বিচারক (কর্তা) পরিচালক থাকেন। যে-কোন সামাজিক ক্রিয়া কর্মে এই কর্তার মূল্যায়ন সর্বাংশে বেশি।

সামাজিক যে কোন ক্রিয়াকর্মে কর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত। বিশেষত বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পরিচালনায় কর্তার মান মর্যাদা সর্বাংশে বেশি এবং তার হুকুম ব্যতীত কোন কার্য নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সুন্দরবনাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় আজও এ নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। সামাজিক নিয়মকানুন এবং শৃংখলা অটুট রাখতে সমাজে কর্তার বিশেষ কর্তৃত্ব আছে।[৩৮]

সমাজে কেউ কোন অন্যায় কর্ম করলে সামাজিকভাবে তার শাস্তির বিধান রয়েছে। সমাজপতিরা একত্রে বসে সমাজে গর্হিত কর্মকারীকে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করেন যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এ ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়। তা ছাড়া জাত-ধর্ম নষ্ট হলে সে যদি আবার সমাজের নিকট অনুগত হয়ে ফিরে আসতে চায় তবে তাকে হিন্দু শুদ্ধিসভার মতে শাস্ত্রানুযায়ী শুদ্ধি সংস্কার করে নেয়া হয়। আর অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ ব্যক্তিকে তার জ্ঞাতি বন্ধু অর্থ সাহায্য করবে।[৩৯] আর উক্ত জাতি নাশের জন্য তার ওয়ারিশগণও গ্লানিমুক্ত হবে যেহেতু সমাজ তাকে শুদ্ধি করেছে। সমাজের নিয়মকানুনের মধ্যে পিতামাতার ভরণ-পোষণ, পণ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিবাহিতা কন্যা গৃহে না রাখা, বিধবা সধবার কর্তব্য, অন্ন সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নমশূদ্র ও মুসলমান ছাড়াও সুন্দরবনাঞ্চলে আদিবাসী মুণ্ডা ও মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। নিম্নে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

আদিবাসী মুণ্ডা

খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে শ্যামনগর ও কয়রা উপজেলায় আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। সমাজের নিম্নবর্ণের অবহেলিত বঞ্চিত মানুষ এ-সব মুণ্ডারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা: মুণ্ডা সম্প্রদায় এবং মাহাতো সম্প্রদায়।

ইতিহাস

বাংলাদেশের মুণ্ডারা উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। স্থানীয়ভাবে তারা বুনো, কুলি, সাঁওতাল বা সরদার নামে পরিচিত। বাংলাদেশে তাদের আগমন সম্পর্কে কোন সঠিক সময় পাওয়া না গেলেও একথা জানা যায় যে, তারা রাঁচী, বাঁকুড়া, নাগপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগনা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছিল। বাংলাদেশে প্রথমত ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের নলডাঙ্গার জমিদাররা রাজবাড়িতে লাঠিয়াল হিসেবে মুণ্ডাদের এনেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৫০ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকরা নীল চাষ করার জন্য তাদেরকে এনেছিলেন এবং সর্বশেষে দক্ষিণবঙ্গের জমিদাররা লবণ জলের প্রাবল্য থেকে কৃষিজমি রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণের জন্য তাদেরকে এনেছিলেন।[৪০]

সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা

বুনো, সাঁওতাল, কুলি বা সরদার রূপে পরিচিত হলেও মুণ্ডাদের নিজস্ব প্রথা এবং আচার-অনুষ্ঠান আছে। তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। অতীতে তারা শান্তির দেবতা শিবের পূজারী হলেও এখন তারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজো করে।

মুণ্ডা সমাজ অতীতে মাতৃতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হলেও বর্তমানে তারা পিতৃতান্ত্রিক। তাদের স্ব-স্ব গোষ্ঠীতে মোড়ল বা রাজা আছেন। মোড়ল একটি গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং রাজা কয়েকটি গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মোড়ল এবং রাজা সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে নির্দেশাবলী দেন।

বিবাহ

অধিকাংশ মুণ্ডা তাদের সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করে। খুলনার কয়রা থানার মুণ্ডারা সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার মুণ্ডাদের বিয়ে করে। তাদের বিয়ে অল্প বয়সে হয়। বিয়ের সময় কনে বরের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তাদের বিয়ে

হয়। বিয়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণই বেশি। মোড়ল বা রাজার নেতৃত্বে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। আজকাল মুণ্ডা বধূরা শাঁখা পরে। অতীতে তারা এটা পরত না।[৪১]

বর্তমান ও অতীত পেশা

প্রাচীনকালে জঙ্গলে কাঠ কাটা এবং নদীতে বাঁধ দেয়া ছিল মুণ্ডাদের প্রধান পেশা। এ ছাড়া তারা জমিদারদের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করত। কঠোর পরিশ্রম করেও তারা স্বল্প বেতন পায়। কৃষিকাজের জন্য তাদের অল্প জমি দেয়া হয়েছিল কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তাদের পেশার পরিবর্তন হয়। বর্তমানে মাছ ধরা, মাটি খনন এবং অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করা তাদের পেশা। এ কাজে তারা বেশ দক্ষ। পুরুষ-নারী শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে। সুন্দরবনের পুকুর-নদীতে মাছ ধরে। বর্শা দিয়ে পাখি শিকার, কচ্ছপ শিকার কাজে তারা দক্ষ। অন্যের জমি লীজ নেয় অনেকে। কিন্তু কোথাও তারা সঠিক পারিশ্রমিক পায় না। সম্প্রতি তাদের অনেকে কার্পেটিং, বৈদ্যুতিক, ঝালাইকরণ এবং মোটর সাইকেল মেরামত কাজে প্রশিক্ষণ নিয়েছে কিন্তু সংখ্যায় তারা নগণ্য।

খাদ্য

খাদ্য নির্বাচনের বিষয়ে সাঁওতালদের সাথে মুণ্ডাদের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। মুণ্ডারা অতিথি পরায়ণ। এখনো তারা অতিথিদের তাড়ি (খেজুর এবং তাল রস থেকে প্রস্তুত) এবং হাড়িয়া দিয়ে আপ্যায়ন করে। হাড়িয়া তারা নিজেরা প্রস্তুত করে। তাদের প্রিয় খাবার হচ্ছে ব্যাঙ, সাপ, ইঁদুর, কচ্ছপ, শামুক, কাঁকড়া, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি।

ভূমি প্রথা

জমিজমা বলতে মুণ্ডাদের নিজস্ব কিছু নেই। বলতে গেলে তারা ভূমিহীন। একসময় মুণ্ডা ও মাহাতোদের কমবেশি জমিজমা ছিল কিন্তু মালিকানা সংক্রান্ত আইনি বিষয় ও দলিল সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাদের জমি হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে। আদিবাসীরা জমি হস্তান্তর করতে পারবে না– এ মর্মে নিয়ম থাকায় অতি সুকৌশলে তাদের নামের শেষে সরদার যোগ করে জমি লিখে নেয়া হতো। ফলতঃ ষাটের দশকে তারা সরদার পরিচিতি লাভ করে। তবে মুণ্ডাদের আবাসস্থল জঙ্গলের সন্নিকটে হওয়ায় বনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজে দিন-মজুরি করেই এদেরকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

মুণ্ডারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুযোগ থেকে সুবিধা বঞ্চিত। তাদেরকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সরকার এবং বেসরকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অতি সম্প্রতি বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মুণ্ডা শিশুদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। একইভাবে স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত এ মুণ্ডাপাড়ায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করে।

মুণ্ডাদের মধ্যে সন্তান জন্মহার বেশি। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা ঔষধ গ্রহণের পরিবর্তে ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্রতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে বেশি। খাদ্য, পুষ্টি এবং পানীয়জল সম্পর্কে অসচেতন থাকায় মুণ্ডা শিশুরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে ওঠে।[৪২]

মুণ্ডারা সমাজের এক পশ্চাদপদ সম্প্রদায়। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কোন কাজে তাদের কোন সম্পৃক্ততা নেই। তারা ভোটার হওয়া সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে না। নির্বাচনের সময় তারা শুধুমাত্র ভোট দেয় কিন্তু নির্বাচনের পর তারা পরাজিত প্রার্থীর রোষানলে পড়ে।

বাসস্থান

দক্ষিণ খুলনায় মানবাধিকার সংস্থা (Human Rights Congress of Bangladesh for Minorities) কর্তৃক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, কয়রা উপজেলায় ২৩০ পরিবারে ১৫০০ জন মুণ্ডা, তালা উপজেলায় ৬৩ পরিবারে ৪০০ জন এবং শ্যামনগর উপজেলায় ৩৬০ পরিবারে প্রায় ১৭০০ জন মুণ্ডা বাস করে। শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা, পারশেমারী, ডুমুরিয়া, সাপখালী, শোলখালি, কালিঞ্চি, ভেটখালি, তারানীপুর, কাশীপুর, ধুমঘাট, শ্রীফলতলী, মুন্সিগঞ্জ, চুনু ও দাতিনাখালী, তালা উপজেলায় হরিণখোলা, বকখালী গ্রামে এবং কয়রার হরিহরপুর গ্রামে মাহাতো সম্প্রদায়ের মুণ্ডারা বাস করে। আর্থিক দিক দিয়ে হরিহরপুরের মাহাতোরা অসচ্ছল। তাদের নিজস্ব জমি-জমা বলতে বাসস্থান ছাড়া ধানক্ষেতের পরিমাণ খুবই কম। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, দৈনন্দিন জীবনে আইনের প্রয়োজনীয়তা, বিকল্প কর্মসংস্থান– এসব কাজে বেসরকারী সংস্থা প্রদীপন, কেয়ার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাপ্ত জ্ঞানকে বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরামর্শ ও মডেল প্রদর্শনীর সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন। এ-সব প্রকল্পের আওতায় ৬টি করে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, হাঁস ও শূকর পালনের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ১৮টি পরিবার বিকল্প আয়ের সুযোগ পাচ্ছে। এ-সব আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়াও এলাকার অন্যান্য পরিবার নিজেদের বসত বাড়িতে অনুরূপ আয়মুখী কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৪৩]

এই ভূমির আদি অধিবাসী হিসেবে মুণ্ডারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে চলেছে। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, হাঁস পালন, বিভিন্ন ধরনের বুনন এবং বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষের মাধ্যমে তারা সমাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

লোকসঙ্গীত

মুণ্ডা সমাজ জীবনের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন হল তাদের লোকসঙ্গীত। মূলতঃ সঙ্গীত হচ্ছে সুর সংযোজিত হৃদয়বাণী।[৪৪] সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তারা তাদের মনের

অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। তাদের নিজস্ব ভাষার কোন গ্রন্থ নেই; ফলে লোকসঙ্গীতগুলো বাণীবদ্ধ কোন লিখিত রূপ পায়নি। অথচ কালের করালগ্রাস অতিক্রম করে লোক পরম্পরায় কাল থেকে কালান্তরে এ সঙ্গীতগুলি মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ সব গানে জন্ম-মৃত্যু, কৃষি কাজ, বিয়ে, প্রেম-ভালোবাসার নানান দিক ফুটে উঠেছে।

দু'জন নর-নারীর দাম্পত্য জীবন পূর্ণতা লাভ করে সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে গৃহে সন্তান-সন্ততি নেই তাদের মনঃকষ্টের শেষ নেই। নিচের গানে তেমনি অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে-

ডাগর ডোগর ছেলাম ঐতা কাদা করে রে
যাহার ঘরে ছেলে নেই তাহার ঘরে কেউ নেই
ডাগর ডোগর ছেলাম ঐতা কাদা করে গো
ডাগর ডোগর ছেলাম ঐতা কাদা করে গো।[৪৫]

ভাবার্থ: যার ঘরে ছেলে নেই তার ঘরে তো কেউ যেতেই চায় না। যার ঘরে ছেলে আছে, সেখানে ছেলে প্রস্রাব, পায়খানা করে, নোংরা করে। তবু সেখানে সকলে যেতে চায়।

গোয়ালপূজার গান

শ্যামা পূজার রাত মুণ্ডাদের নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি জাগরণ রাত। এ রাতে তারা গরুর মঙ্গল কামনায় গান কমর-

ওরে ওহে রে এদি আজি বাহারে
এদি আজি বাহারে আমাসি রাতি ও
রিদা আজি বারে লগন আমাসা রাতি ও।
ওরে এদি আজি বাহারে এ আমাসি রাতি ও
দি আজি বাহারে বকুচুরে বকুচি
দি আজি বারে লগন আমসা রাতি এ
ওরে রে ওহে রে বিজি কুটে এঘড়ি যে কুটে
এ আমসা রাতি গো।
গড়ি যে কুটে লগল আমসা রাতি ও।[৪৬]

ভাবার্থ: অমাবস্যা রাতে গোয়াল পূজা করা হয়। এটি জাগরণ রাত। শ্যামা কালী পূজার সময় সবচেয়ে বড় দিন মনে করা হয়। সারারাত জেগে গান গাওয়া হয়। তাদের প্রার্থনা– গরু, বাছুর, ছেলে-মেয়ে সকলে যেন ভাল থাকে।

বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে দুঃখের গান-

গার দেকু না ওকি গর দেকু না
ঘর ধরি শুনি ঘর সমান না
বেলা নাইয়ে দেকি ঘর অ ঘরি ঘর সমান নেই
বেলা ক্ষেতে সমান নাই ওকি বাহর সময় নাই
ঘর ঘরি বিন ঘর সমান নাই
বেলা ঘর বিন সমান ঘর সমান নাই
বেলা ক্ষেতে সময় নেই ওকি বাহর সময় নাই
মাইয়ে দ্বিতল বাড়াই বিন ঘর সময় নাই।[৪৭]

ভাবার্থ: আমি আমার ঘর-বাড়ি, বসত ভিটা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ির কাছে এসে দেখি ঘর-বাড়ি নেই। বেলা শেষে দেখি ঘর দোর আর কিছু নেই। আগের মত সে সৌন্দর্য আর নেই। ঘর-বাড়ি সব শেষ। কিছু নেই। বেলা শেষে দেখি যে রকম ঘর ছিল– সে রকম আর কিছু নেই। বিল, মাঠ আগের মত আর নেই। দোতলা বাড়িতে মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম, সে ঘর-বাড়ি আর নেই।

মরণের পরের গান-

বাটালে না বাটা ছাই মাকু ও মাকু
বাছা দোর কুচা হলো দিন
মাকু ও মাকু বাছাদোর কুচা হলো দিন
কুপেতে তেল নাহিকে বাটিতে নাই হলদি নাহিকে
মাকু ও মাকু বাছাদোর কুচা হলো দিন।[৪৮]

ভাবার্থ: সবাই ছাই-মাটি (ধুলোমাটি) বেটে গায়ে মাখো। বাছা, তোর দিন শেষ হয়ে গেছে। মাখো মাখো ছাই মাটি, বাছা তোর দিন শেষ হয়ে গেছে। কুপিতে (টেমিতে) তেল নেই, বাড়িতে হলুদ নেই– কি মাখাবো? গায়ে ছাই মাটি মাখো, বাছা তোর দিন শেষ হয়ে গেছে।

জমি চাষ করার গান

মুণ্ডাদের নিজস্ব জমি-জমা বলতে কিছু নেই। মহাজনের জমি চাষ করে। অনেক সময় ধান হয় না। কিন্তু মহাজনের কাছে কি জবাব দেবে? জমিতে ভাল ধান হয়নি। মহাজনের কাছে দাদার বকুনি শুনতে হবে। একজন বোনের আর্তি এভাবে ফুটে উঠেছে-

বৈশাখের জোড়া কালো জমিদারের কপাল ভালো
নাকে জমি যদি চাষ দাও জোয়ার ভাটি খেলে বারমাস
দক্ষিণ মাসে আলু ভাল লেজায় যেন বর্গি ধান

হায়রে হায় আয়রে বৃষ্টি কেমলি দাদা রাম রাম
মহাজনকে কাহাবেন কি দদি সবাই বল রাম রাম
মহাজনকে কাহাবেন কি দদি
বৈশাখের গোড়া কালো জমিদারের কপাল ভালো
নাকের আমি নাকে আমি সহি দাদা
জোয়ার ভাটি খেলে বারমাস।[৪৯]

ভাবার্থ: বোন বলছে- "আমার দাদা মহাজনের জমি চাষ করছে। জমিটা অবশ্য ধাপা (নিচু) জমি। বন্যার ফলে ধান হয়নি। তাই আমার দাদা জমির আইলে বসে কান্নাকাটি করছে। মহাজনের কাছে কি জবাব দেবে?" আমি বলেছিলাম- "দাদা, ধাপা জমি চাষ করো না। কিন্তু তবুও তুমি চাষ করলে। এখনতো শুধু রামকে ডাকলে হবে না। কিছুতো হয়নি। মহাজনের কাছে একটা জবাব তো দিতে হবে।"

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের জীবনের বিশেষ দিকের উন্মেষ ঘটে। হৃদয়ে জন্ম নেয় প্রেম। সকল সংশয়, বাধা উপেক্ষা করে হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত হয় এভাবে-

হরিণটাকে বাঁইধে রাখো নতুন যৌবনে
ও রসের কেলিয়া ভাওরে
বসে বসে প্রেম করো নবীন ছোকরা
বসে বসে প্রেম করো নবীন ছোকরা।
কেউ বা গেছে কাঠ কুড়োতি কেউবা গেছে বনে
বলি হরিণটাকে বাঁইধে রাখে নতুন যৌবনে
ও রসের কেলিয়া ভাওরা
বসে বসে প্রেম করো নবীন ছোকরা।[৫০]

ভাবার্থ: নবীন-নবীনা মাঠে ঘোরাফেরা করছে। কেউবা কাঠ কুড়াচ্ছে। কেউবা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সুযোগে প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে যুবক-যুবতী প্রেমে মত্ত আছে।

মুণ্ডারা অতিথি পরায়ণ। তাই বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে এলে অতিথি আপ্যায়নের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। নিচের গানে অতিথি আপ্যায়নের চিত্র ফুটে উঠেছে-

কেলিয়াকে ভাত দিব ও কোথায় পাব মেগুর মাছ
দেড়কা মাছের ওকালতি রিক বদন কালিয়া
দেড়কা মাছের ওকালতি রিক বদন কালিয়া
কেলিয়াকে ভাত দিব ও কোথায় পাব মেগুর মাছ
দেড়কা মাছের ওকালতি রিক বদন কেলিয়া।[৫১]

ভাবার্থ: বন্ধু বাড়িতে এসেছে। তাকে ভাত দিব কি দিয়ে? মাগুর মাছ ধুতে গেছে কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাই ছায়া মাছ রেঁধে ভাত দেয়ার কথা বলছে।

পেশাজীবী সম্প্রদায়

সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায় বলতে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। সাধারণত প্রতি বছর গড়ে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ সুন্দরবনে কাঠ কাটা, মাছ ধরা, মধু, মোম, গোলপাতা, ছন, মেলে ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের কাজে নিয়োজিত থাকে। এ ছাড়াও এ অঞ্চলের মানুষ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, নৌকা তৈরী, ঘর তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ, জালে দেয়ার জন্য গরানের কষ, মোম, শামুক, জোংরা, তাজা মাছ ও শুঁটকী করার মাছ সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে যায়।

নিম্নে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর তালিকা দেয়া হলো:

ক্রমিক	কাজের ধরন	শ্রমিকের পরিচয়	শ্রমিকের সংখ্যা
১	জ্বালানী-কাঠ কাটা, গোলপাতা ও বনজ দ্রব্য সংগ্রহ	বাওয়ালী	১,৫০,০০০
২	মধু ও মোম সংগ্রহকারী	মৌয়ালী	৮,০০০
৩	শামুক সংগ্রহ/ চুন তৈরি	চুনারী/জোংরাখুটা	৩,০০০
৪	নৌকা মেরামত ও তৈরি	ছুতোর/মিস্ত্রি	২,০০০
৫	কাঠ-চেরাই	ছুতোর	১,০০০
৬	সুন্দরবন সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক	ছুতোর	১৫,০০০
৭	সুন্দরবন সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ী	মৎস্যজীবীসহ বিভিন্ন পেশার ব্যবসায়ী	১,১৫,০০০
৮	অন্যান্য ধরনের শ্রমিক		১০,০০০
		মোট	৩,০৪,০০০[৫২]

বাওয়ালী

সুন্দরবনের বনজ সম্পদ যথা– কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহকারীকে সাধারণভাবে বাওয়ালী নামে অভিহিত করা হলেও বাওয়ালী শব্দের নামের ব্যাপকতা রয়েছে। বাউলে, বাবলে প্রভৃতি শব্দগুলি বাওয়ালী শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু সুন্দরবনে বনজ সম্পদ যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে নানা প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে চলতে হয়। বাওয়ালী অর্থ সাধারণভাবে 'বনবাসী'কে বোঝায়।[৫৩] সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে যে বাওয়ালী ছাড়া সুন্দরবনে প্রবেশ করা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ গুণিন

বাওয়ালী সুন্দরবনের রক্ষয়িত্রী দেবী মা বনবিবিকে সন্তুষ্ট করে হিংস্র জীব-জন্তুর হামলার ভীতিকে প্রতিহত করতে পারে। সুন্দরবনের মধ্যে গমনাগমনকারীদের যে বিষয়টি সবচেয়ে বিচলিত করে তা হলো ভয়। 'ভয়' শব্দটিকে কেন্দ্র করে গোটা সুন্দরবনের জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়। গুণিন বাওয়ালীরা সাধারণত যারা পাস সংগ্রহ করে সেই মহাজন বাওয়ালী ও দিনমজুর বাওয়ালী উভয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মহাজন বাওয়ালীরা সুন্দরবন থেকে কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহের অনুমতি পেয়ে থাকে। আর যারা দিনমজুর বাওয়ালী তারা মহাজনের অধীনে কাজ করে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাওয়ালীদের ৫৪ শতাংশ দিনমজুর বাওয়ালী, ৩৯ শতাংশ মহাজন বাওয়ালী আর অন্যান্য ৭ শতাংশ বাওয়ালীরা সুন্দরবন সংলগ্ন ওয়াপদা রাস্তা বা বেড়ি বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। বেড়িবাঁধ থেকে বেশ ভেতরের গ্রামগুলিতে বাওয়ালীরা বসবাস করে।

মহাজন বাওয়ালী

মহাজন বাওয়ালীরাই কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের এ বনজ সম্পদ সংগ্রহের কাজ শুরু হয় নভেম্বর মাসে, শেষ হয় ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে। সাধারণতঃ যে সময় তারা কাঠ কাটতে যায় সে সময়কে বাদা কাটতে যাওয়ার মৌসুম বলা হয়। তারা প্রথমে রেঞ্জ অফিস থেকে বি.এল.সি. (Boat Licence Certificate) পাস সংগ্রহ করে নেয়। ১০-১৫ টাকা মন প্রতি গরাণ বা অন্যান্য কাঠের রাজস্ব দিতে হয়। একথা সত্য যে, গরাণ বা অন্য কাঠের ক্ষেত্রে ফরেস্ট অফিসারদেরকে নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়। তবে কূপের কূপ অফিসারকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়।

বাওয়ালীদেরকে কূপ অফিসার ছাড়াও বিভিন্ন ডাকাত দলকেও চাঁদা দিতে হয়। এক প্রকার বাধ্য হয়েই মহাজন বাওয়ালীরা বন কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে। তবে অধুনা ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা একশ্রেণীর মধ্যসত্ত্বভোগী বাওয়ালীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাওয়ালীরা একবারে ১৫-২০ দিনের জন্য কাঠ কাটার অনুমতি পায়। মহাজন বাওয়ালীরা খুব কমই বাদায় যায়। তাদের অধীনে ৮-১০ জন দিনমজুর বাওয়ালীর দল সুন্দরবনে কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহ করে থাকে। অনেক সময় মহাজন বাওয়ালী ও মাঝি একই ব্যক্তি হয়ে থাকে। কারণ মহাজন বাওয়ালীর প্রতিনিধি হিসেবে একজন মাঝি থাকে। এরা বছরে ২ থেকে ৩ বার গোলপাতা সংগ্রহ করে থাকে। কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহ করতে হলে ঘুষ দেয়ার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ডাকাতদের উৎপাত ও ফরেস্ট অফিসারদের দুর্নীতির কারণে বাওয়ালীরা এখন আর পূর্বের মত লাভবান হতে পারছে না। এ-ছাড়া আরেকটি বিধিনিষেধ বহুলভাবে দৃষ্ট হয় তা-হলো

কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই তা আবার প্রত্যাহার করা। এ রকম ২০০২ সালে বন বিভাগের গৃহীত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বাওয়ালী তাদের বি.এল.সি নবায়ন করে সুন্দরবনে যেতে পারেনি।[৫৪] এ পেশাকে তারা আর লাভজনক মনে করছে না।

দিনমজুর বাওয়ালী

দিনমজুর বাওয়ালী মাটি থেকে উঁচুতে মাচা বানিয়ে তার ওপর রাত কাটায়। সারাদিন তাদের পরিশ্রমের শেষ নেই। হাড় ভাঙ্গা খাটুনি শেষে তারা সন্ধ্যায় মাচার দিকে আসে। সকলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'মালে' নামে আর হিংস্র জীব-জন্তুর ভয়কে উপেক্ষা করে এরা কাজ করে। এদিকে বাড়িতে তাদের পরিবারবর্গ গভীরভাবে অপেক্ষা করে। একজন দিনমজুর বাওয়ালী গোলপাতা সংগ্রহের মৌসুমে সর্বোচ্চ ৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে।

সুন্দরবনে দিনমজুর বাওয়ালীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। তাই তাদের আর্তি অন্যকোন কাজের সুযোগ থাকলে তারা আর এ পেশায় আসতো না। অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তাদের সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তারা মূলতঃ কাজ করে মহাজনের নির্দেশমত। পেশার বাইরে দিনমজুর বাওয়ালীরা অন্যান্য কাজ করে। প্রায় ৮৫% দিনমজুর বাওয়ালী ফরেস্ট অফিস থেকে পাস সংগ্রহ করে সুন্দরবনের খাল, নদীর মাছ, কাঁকড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করে থাকে।

গুণীন বাওয়ালী

সুন্দরবনে গমনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে গুণীন বাওয়ালী সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। কারণ তারা তাদের মন্ত্র বা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাবলে হিংস্র জীব-জন্তু বা অন্য কোন বিপদ থেকে বনে কর্মরত পেশাজীবীদের রক্ষা করতে পারে বলে সকলে একমত প্রকাশ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা মন্ত্র-তন্ত্র জানে তাদেরকে গুণীন বাওয়ালী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মন্ত্র-তন্ত্র জানা মানুষকে হুকুমে বাওয়ালী বলা হয়। গুণীন বাওয়ালীরা শুদ্ধমনে জঙ্গলে উঠে প্রথমে ছোট সুন্দরী গাছে হাত দিয়ে 'মাল' করে। 'মাল' করা অর্থ দেব-দেবীর নাম স্মরণ করা যাতে জীব-জন্তু থেকে কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। তাদের ধারণা মালের কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী এই মাল কার্যকরী হয় এবং এর মধ্যে কোন জীব-জন্তু থাকলে মন্ত্রের দ্বারা তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। এ-সব মন্ত্রতন্ত্রের নামও বড় চমৎকার। যথা— দুকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র, খিলান মন্ত্র, আলসে দেয়া মন্ত্র।[৫৫] অপরদিকে হুকুমে বাওয়ালীরা পীরের রুমাল নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং এরা আলী বদর শাহ জঙ্গলীর দোহাই দেয়। একজন বাওয়ালীর আবার ৭/৮ জন করে শিষ্য থাকে। এরা বয়সে জ্যেষ্ঠতাকে বেশ মান্য

করে। তবে একথা সত্য যে, জঙ্গলে থাকাকালীন গুণীন বাওয়ালীরা সর্বদা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ থাকে।

বাওয়ালীদের কিছু অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য রয়েছে। যেমন– বনবিবির পূজা বা গাজীর গানে তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। সুন্দরবন তাদের কাছে পবিত্রতম স্থান। শুধু শুক্রবারে হুকুমে বাওয়ালীরা জঙ্গলে ওঠে না। গুণিন বাওয়ালীরা কখনো কাঁকড়া খায় না। নানাবিধ জটিলতা আর সমস্যার কারণে বাওয়ালীরা আর আগের মত জঙ্গলে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, ডাকাতের ভয়, পাস পাওয়ার বিড়ম্বনা ইত্যাদি কারণে তাদের আগ্রহ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।

মৌয়ালী

সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। মাছ, কাঠ, গোলপাতার পাশাপাশি মধুও এখানের একটি মহামূল্যবান সম্পদ। পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মধু সংগ্রহ করে তারা মৌয়াল, মৌয়ালী বা মৌলে নামে পরিচিত। তারা দলবদ্ধভাবে ছোট বড় নৌকা সহযোগে মৌচাক ভেঙ্গে মধু সংগ্রহ করতে যায়। বেতের ধানী মাটির কলস নিয়ে এরা মধু সংগ্রহ করতে যায়। একটি দলে সাধারণত ১৩ জন লোক থাকে। তাদের মধ্যে একজন থাকে নৌকায় পাহারা দেয়ার জন্য। তার কাজ নৌকায় পাহারা দেয়া এবং ভাত রান্না করা এবং মধু সঠিকভাবে নির্দিষ্ট পাত্রে সংগ্রহ করা। দলীয় ভাষায় তিনি দারোগা নামে পরিচিত।

মধু সংগ্রহ করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ মৌয়ালের দৃষ্টি সবসময় উপরের দিকে নিবদ্ধ থাকে।[৫৬] অসতর্কতার কারণে এ-জন্য তাদেরকে মাঝে মাঝে মানুষখেকোর কবলে পড়তে হয়।

খড়কুটো একত্রে বেঁধে উঁকো বা তড়পা তৈরি করা হয়। তাতে আগুন লাগিয়ে জঙ্গলে ধোঁয়া ছাড়লে মৌমাছি বের হয়ে মৌচাকের দিকে ধাবিত হয়। কোন বিপদ হলে 'কু' সঙ্কেত দিয়ে মৌয়ালরা অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাদের প্রতিনিয়ত বাঘের আক্রমণের ভয়ে থাকতে হয়। বাঘের আক্রমণে এ পর্যন্ত বহু মানুষ মারা পড়েছে। ২০০২ সালে আটজন, ২০০৩ সালে আটাশজন, ২০০৪ সালে সতের জন বাঘের হাতে মারা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জেলে, গরানকাটা, গোলকাটা বাউলে, মউলে, বনবিভাগের একজন কর্মচারী এবং একজন ডাকাত। ২০০৩ সালে বনবিভাগের একজন ফরেস্টার ডিঙ্গিমারীতে তাঁর অফিস এলাকাতেই বাঘের হাতে নিহত হন।[৫৭]

মৌয়ালরা আলাদা কোন সম্প্রদায় নয়। সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বসবাসরত সাধারণ মানুষের স্থানিক বৃত্তি মৌলেগিরি। এ-সব মৌলেদের পদবী হয়ে থাকে সর্দার, সানা, মোড়ল, গাজী, মোল্লা ইত্যাদি আর হিন্দু মৌলেদের পদবী কয়াল, সর্দার, কাগ ইত্যাদি।

এরা সারা বছর যে মধু আহরণ করে তা নয়। মধু সংগ্রহের সময় ছাড়া বৎসরের অন্যান্য সময় এরা মজুর, ঘের মজুর, চিংড়িপোনা ধরা, কাঁকড়া মারা, গরান, গোল কাঠ, হেঁতাল, ঘাস কাটা বাওয়ালীর পেশা ধারণ করে।[৫৮] এদের অনেকে জোংড়া খোটার কাজও করে। সরকারী হিসাব মতে বছরে ৪-৫ হাজার মণ মধু সুন্দরবন থেকে আহৃত হয়।

চুনারু

যারা সন্দুরবনে শামুক ও জোংরা কুড়িয়ে জীবন নির্বাহ করে তারা চুনারু নামে পরিচিত। তারা সরকারি রাজস্বের বিনিময়ে শামুক, জোংরা, কাঠ কুড়ায়। মূলধন ও নৌকার অভাবে তাদেরকে মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হয়। শামুক, জোংরা কুড়িয়ে তা পুড়িয়ে তারা চুন তৈরি করে।[৫৯]

মৎস্যজীবী

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রাচীন চর্যাগীতিতে তা সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে:

তারিত্তা ভব জলধি জিম করি মা-আ সুইনা
মারু বেনী তরঙ্গ মই মুনি আ।[৬০] (চর্যাগীতি)

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মাঝ নদী, যেখানে জীবনের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মাছের সন্ধান করছে মানুষ। অধুনা মৎস্য আহরণ শিল্প বাণিজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় যে সব অঙ্গনে মৎস্যজীবীরা বেশি বাস করে তা হলো বরগুণা, পাথরঘাটা, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। জেলেরা অনেকে তাদের মৌলিক পেশা থেকে সরে এসেছে। তারা অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, রেডিও সিগনাল, বাতিঘর, দিকদর্শন, ঔষধপত্র, খাবার পানি, জলদস্যু ও ডাকাতদের উপদ্রব, বনবিভাগের চাঁদাবাজি ইত্যাদি। মাছ ধরার উপকরণ উন্নত বিশ্বে আধুনিক মানের হলেও আমাদের দেশে উন্নতমানের প্রযুক্তি বা উপকরণের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জেলে বা মৎস্যজীবীরা সাধারণতঃ যে সব নৌকায় মাছ ধরে তার নাম ডিঙ্গি, চান্দি, বালাম নৌকা। গঠন প্রকৃতি এবং ধারণ ক্ষমতা অনুসারে নৌকার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। আদি বৃত্তিধারী জেলেরা বর্তমানে অনেকটা কমে গেছে। পেশা পরিবর্তনের ফলে অনেকে মাছ ধরার পেশায় অংশগ্রহণ করেছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মুসলমান, খ্রীস্টান, বাওয়ালী, মৌয়াল, কাঠুরিয়া, জেলে, চুনারু নানা জাতের মানুষ বাস করে সুন্দরবনে। অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি অমিলও আছে প্রচুর। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব রীতি-নীতি, আচার-আচরণগত বৈশিষ্ট্য

রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিয়া কর্ম জনিত পার্থক্য ও বিধিনিষেধ থাকলেও আজকাল বিবাহ বিষয়ে আর তেমন কোন বাধা-বিপত্তি নেই। অনেকের মধ্যে সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশঃ। এ ছাড়া আরো কিছু মানুষ বাস করে তারা জিয়ানী বা মোলঙ্গী নামে পরিচিত। নমশূদ্র সমাজের এক শ্রেণীর লোক যারা মৎস্যজীবী তারা জিয়ানী নামে পরিচিত। আর লবণ প্রস্তুতকারী মৌলঙ্গী নামে খ্যাত।[৬১] জেলেরা জঙ্গলের নদীতে মাছ ধরে আর মালোরা পুকুর বা জলাশয়ের মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় এ-সব বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কিছু মানুষ সেবা দিয়ে থাকে। যেমন– দোকানী, দিনমজুর ইত্যাদি। এরাও সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল। তাদের কাজ কর্ম সবই গ্রাম ভিত্তিক। বাঙালী জীবন মূলতঃ গ্রাম কেন্দ্রিক এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই সাধারণ বাওয়ালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হত। এখন পরিবর্তন ঘটছে। এর কারণ আমাদের আদিম জীবন ধারায়– যে জীবনে প্রধান জীবনোপায় শিকার ও কৃষি এবং খুব ছোট ছোট গৃহ শিল্প, এবং যার সমাজ জীবনের প্রধান আশ্রয় গোষ্ঠী ও পরিবার। স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শস্য, মাঠ, নদ-নদী, খাল-বিলের এবং অরণ্যকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে এবং এভাবেই গ্রামের পত্তন হয়।

সুন্দরবনে প্রতিবছর হাজার-হাজার পেশাজীবী সম্প্রদায় গমন করলেও বনের মধ্যে পানীয় জলের বা চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নেই। তাই কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলে মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় হলেও বনে গমনকারী বা বনরক্ষাকারীদের জীবন রক্ষার জন্য কোন সুবন্দোবস্ত নেই। সব সময় নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন কাটে। অন্যদিকে সংঘবদ্ধ কাঠচোর এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা সুন্দরবনে অবৈধ কর্মকাণ্ড চালায়। তারা একদিকে যেমন বন্যপ্রাণী ও বৃক্ষ সম্পদ ধ্বংস করে তেমনি বনজীবীদের জিম্মি করে মুক্তিপণ দাবী করে। দাবী পুরণ না হলে অনেক সময় জীবননাশ করে।

আমোদ উৎসব

সুন্দরবনাঞ্চল আনন্দ-উৎসবের জন্য সুখ্যাত। এখানে বারো মাসে তের পার্বণ তো লেগেই আছে। বনদেবী নির্ভর এ অঞ্চলে বনবিবির পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। মাঘ মাসের শেষ দিনে সুন্দরবনাঞ্চলের বিশেষ স্থানে বনবিবির পূজায় গ্রামাঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে। বনের রক্ষয়িত্রী দেবীর কৃপা লাভের নিমিত্ত এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গলের হিংস্র পশু, জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে এ পূজানুষ্ঠান জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় তার বর্ণনা দেয়া হলো:

চড়ক পূজা

চড়ক পূজা মূলতঃ শিবের পূজা। গোটা চৈত্র মাস জুড়ে বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম এবং আচার, নিয়মকানুন পালনের মাধ্যমে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে চড়কপূজা চিহ্নিত ছিল। বলা যায় এত বেশি মানুষের সমাগম অন্য কোন অনুষ্ঠানে সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে আজকের মত দুর্গা পূজা আদৌ হত না। সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন বাড়িতে সীমাবদ্ধভাবে দুর্গা পূজা হত। আজ যেমন বারোয়ারি পূজার বাহুল্য দেখা যায় সে যুগে আদৌ তা ছিল না। চড়ক পূজায় বিশেষভাবে কৃষিজীবী মানুষের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলি এ উৎসবে মেতে ওঠে। শিব বাঙালির কৃষিজীবী সমাজের আপনজন, তার দুঃখ বেদনা সাংসারিক হাসি-কান্নার সাথে এই শিব মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে।[৬২]

চৈত্র সংক্রান্তির আগের কয়েকদিন সন্ন্যাসীরা পাথরের শিব মস্তকে ধারণ করে নানা রকম ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। মূল সন্ন্যাসী শিবকে মস্তকে ধারণ করে। সাথে থাকে অন্যান্য সন্ন্যাসী, বালাদার, ঢাকী, বাজনদার, চড়কের সঙ। নানা রঙে সজ্জিত হয়ে শিব ও পার্বতী দলের সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায়। গৃহস্থ ভক্তরা ভক্তিভরে, শিবকে ডাবের জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেন এবং শিবের চরণামৃত পান করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের দিনগুলিতে সমস্ত সন্ন্যাসী সাংসারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্বভার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে সকলে মিলে রান্না করে এবং নিরামিষ আহার করে। দিন রাত কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে শিবের কৃপা লাভে তারা তৎপর হয়। শিব পূজার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে মানুষের কৃষি উৎপাদন এগিয়ে চলে। সুতরাং, চড়ক পূজার দিন গোটা সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষ মহা আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে।

শিবোৎসব প্রকারান্তরে শস্যোৎসব। কেননা চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ পুষ্পমহালয়ার* আটদিন আগে শিবলিঙ্গের সাথে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক শিবের বিলাস পাট নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর এই অর্ঘ্যাকৃতির পাটের সামনে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে যে নৃত্য-গীতাদি এবং অভিনয় ক্রিয়া হয় তা মূলতঃ উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির প্রত্যাশায়। এ ছাড়া শিবোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিঙ্গ পূজান্তে ভূমিকর্ষণ এবং বীজবপণ, যা মূলতঃ প্রজনন প্রক্রিয়া বুঝায়।[৬৩] শিব পূজার অনুষ্ঠান হর-গৌরীর বিয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

---

* c®ú gvm ej‡Z ˆPÎ gvm‡K eSvq Avi kvi`xqv Agvem¨vi gnvjqvq †hgb †cZc‡¶i AvMgb N‡U, †Zgvb wk‡ei mv‡_ †c‡Zi AvMgb N‡U weavq GB DrmewU‡K c®úgnvjqv ejv nq|

অতঃপর তাদের কৃষি জমিতে স্থাপন করে ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনের কাজ চলে। আর এই বীজ বপনান্তে অর্থাৎ কৃষি পত্তনের মাধ্যমে শিবারাধনা সমাপ্ত হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে উৎসব আনন্দের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজাই সবচেয়ে বড় পর্ব। দুর্গা দেবীর আগমনে ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

মুসলমানদের দুটি বড় পর্ব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এই দু'টি পর্বে সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষ সাধ্যানুসারে নতুন পোশাক পরিধান করে। ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলের মাঝে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় পর্ব বড়দিন। ২৫শে ডিসেম্বর প্রভু যীশু খ্রীস্টের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ মহানন্দে মেতে ওঠে। বিশেষতঃ মোংলার শেলাবুনিয়ার খ্রীস্টান পল্লীতে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। এ ছাড়া শ্যামনগর, বড়দল, পাইকগাছা, কালিনগর, চালনা, বাজুয়া প্রভৃতি এলাকায় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বড় দিনের আনন্দে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে একীভূত হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে লোকজীবনের মধ্যে বাস করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-ধুলিয়াপুর, বাজতপুর সম্প্রদায়, ধুলিয়াপুর মৎস্যজীবী (বাগ্দী), আদিবাসী (সাঁওতাল ও মুণ্ডা), নমশূদ্র, মুসলমান সুন্নি ও কাদিয়ানী। এ ছাড়া বাস করে বাওয়ালী, জেলে, মালো, কর্মকার, চর্মকার, মোলঙ্গী।

খাদ্য

সাধারণতঃ ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, ডিম, দুধ প্রভৃতি খাদ্যই এ অঞ্চলে প্রচলিত। আদিবাসী শ্রেণী যে কয়েক ঘর এ অঞ্চলে আছে তারা একসময় ইঁদুর ও শামুক খেত। এখন অবশ্য তাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে।

পোশাক

ধুতি, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, শাড়ি, মেয়েদের ফ্রক, মুসলমান শ্রেণীতে মহিলাদের মধ্যে বোরকা, পাজামা, পাঞ্জাবী, মেয়েদের কামিজ সাধারণভাবে প্রচলিত। ঋতুভেদে পোশাকের পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্যান্ট, শার্ট, কোর্ট এখন স্কুল-কলেজে সব শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত। শীতকালীন পোশাক চাদর, মাফলার, জ্যাকেট সচরাচর ব্যবহার চলে।

আগে এলাকার মানুষ এক ধরনের জামা পরত যাকে 'ছদুকা' বলত। কোটের মত বুক চেরা, দুই পাশে বুকে দুটি পকেট, সাইডে পকেট, ভিতরে পকেট থাকতো। হিন্দুরা প্রায়ই ৮/৯ হাত ধুতি হাঁটুর ওপর ওঠে এমনটা পরত– গান্ধীজীর কায়দায়। হিন্দুরা লুঙ্গি আগে ব্যবহার করত না। মুসলমানরা লুঙ্গি ব্যবহার করতো।

অলংকার

অলংকারের ব্যবহার অতীত কালের তুলনায় বর্তমানে একেবারে কমে গেছে। আগের দিনে মেয়ের বিয়ে হলে পায়ের মল, হাতের বাজুবন্দ (তাবিজ), নাকের বাই আনা, কোমরে সিকিহার, গলায় মাদুলীর ব্যবহার ছিল। বাড়িতে নতুন বধূ হাঁটতে লাগলে পায়ের মল ঝুম ঝুম করে বাজতো– বোঝা যেত নতুন বৌ আসছে। এখন আর সেগুলো নেই। বড় জোর কানের দুল, গলার হার, কপালে টিকলি– এই সচরাচর ব্যবহার চলে। আঙ্গুলে দুই একজন রূপার চুটকি ব্যবহার করে।[৬৪]

প্রসাধনী

হিন্দু মহিলাদের প্রসাধনী ছিল শাঁখা সিঁদুর, আলতা, কাজল, মুসলমানরা পরে সুরমা। এখন এগুলো সবই আছে তৎসহ টিপ, ব্যান্ড, ঝুরি, ক্লিপ, পালিশ ও নতুন নতুন অত্যাধুনিক প্রসাধনী সংযুক্ত হয়েছে। এখন মেয়েরা নেল পালিশও ব্যবহার করে। পুরুষরা পাউডার ব্যবহার করত। এখন স্নো, সুগন্ধি প্রভৃতি ব্যবহার করে।

আগে মেয়েরা কাপড়ের পাড় দিয়ে চুল বাঁধত। প্রাচীন বুড়িরা কাপড়ের এ অংশকে 'আইট' বলত। এখন মেয়েরা বাজারে ক্রয়কৃত চুলের গুছি ব্যবহার করে। হিন্দু সমাজে মেয়েদের কপালে, হাতে, নাকে বড়ি কালি বা দোয়াতের কালি সূঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এক ধরনের চিহ্ন করত। এই চিহ্নকে আদিতে বলত 'মাচতে'। পরবর্তীকালে এর মার্জিত নাম 'রাখালে ফোঁটা'। এই 'রাখালে ফোঁটা' সম্পর্কে একথা প্রচলিত আছে যে, পূর্বে এ দেশে বর্গীর উৎপাত হত। বর্গীরা এ দেশের ভাল ভাল নিখুঁত মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত। গ্রীষ্মের দিনে এই বর্গীর উৎপাত বেশি হত। দুপুরে ছেলে-মেয়েরা না ঘুমোলে বা কাঁদলে বা শব্দ করলে তাদেরকে ভয় দেখানো হত। যাতে তাদের কান্না থামে। ফলে তারা শান্ত হয়ে যেত। তাইতো সেদিন অনেকেই ছড়া কাটতো–

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।[৬৫]

মেয়েদের হাতে পায়ে নাকে খুঁচিয়ে ক্ষত করে দিলে তারা তো আর নিখুঁত থাকতো না। ফলে ঐসকল মেয়েদের তারা ধরে নিয়ে যেত না। তাই বর্গীর ভয়ে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই প্রথার প্রচলন ছিল।

এখানে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বসবাসরত পেশাজীবী সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল। যেহেতু পেশার সাথে সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাই পেশা ক্ষয়ে গেলে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। মাটি ও জলের সাথে পেশা একীভূত। নদীকূলে বসবাসরত মানুষ নদীভাঙ্গনের আশংকায় সর্বদা চিন্তান্বিত থাকে। নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস তাদের জীবনের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে। এমন পরিস্থিতিতে জীবন-

জীবিকার প্রয়োজনে অস্তিত্ব রক্ষায় অনেকে কাঠকাটা বা মৎস্য সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবর্তন করে ভ্যান চালনা, মুদি দোকান চালু বা পোল্ট্রি ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনে কাজ করা একদিকে যেমন জীবনের নিরাপত্তাহীনতা অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির বৈরী অবস্থার সাথে মোকাবিলা করা – তবু এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা থেমে থাকে না। বেঁচে থাকার তাগিদে সব প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলে জীবনের গতি।

তথ্যনির্দেশ

১. J.H. Hutton, *Census of India*, Vol. 1, Part 1, ১৯৩৩, পৃ. ১৯৩
উদ্ধৃত: মুহম্মদ আবদুল খালেক, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩ উদ্ধৃত: ঐ, পৃ. ১৫
৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, কলকাতা, পৃ. ১১
৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৬
৫. ক) Dr. B.S. Guha, An Outline of Racial Ethnology of India Asiatic Society of Bengal, কলকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ১৪
খ) D.N. Majumder, *Races and Cultures of India*, Bombay, ১৯৬১, পৃ. ১০-১৩
৬. ক) Herbert Rislay, *The People of India*, Thacker Spink and Co., কলকাতা ১৯০৮, পৃ. ৪৯-৫০; খ) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
গ) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯
৭. ক) Herbert Risley, *The People of India*, পৃ. ৪৭-৪৮
খ) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৮. ক) B.S. Guha, *An Outline of Ethnology in India*, পৃ. ১৪-১৫
খ) D.N. Majumder, *Races and Cultures of India*, পৃ. ১০-২০
৯. B.S. Guha, *An Outline of Ethnology in India*, পৃ. ১৪
১০. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭
১১. ক) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
খ) B.S. Guha, *An Outline of Ethnology in India*, পৃ. ১৪
১২. ভোলানাথ ঘোষ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,* পৃ. ২
১৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৪. ঐ, পৃ. ১৬
১৫. ভোলানাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১৬. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৭. ঐ, পৃ. ১৬
১৮. ঐ, পৃ. ১৬
১৯. ঐ, পৃ. ১৬
২০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, পৃ. ১১

২১. ক) নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম সাহিত্য, পৃ. ৪
২২. রফিকুল ইসলাম খোকন, *সুন্দরবনের লোকসমাজ ও লোকধর্ম*, পৃ. ২২৪
২৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ৩য় সংস্করণ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি, খুলনা, ২০০১, পৃ. ১১৪
২৪. আশরাফ-উল-আলম টুটু সম্পাদিত, *সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় জনগণের জীবন-জীবিকা*, সিডিপি, খুলনা, জুন, ২০০৪, পৃ. ২৩
২৫. K.G.M. Latiful Bari (সম্পাদিত), *Bangladesh District Gazetteers Khulna*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৭৬.
২৬. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭
২৭. রেভা: ফাদার মারিনো রিগন, *শেলাবুনিয়ার রূপকথা*, খুলনা, ২০০৪, পৃ. ৪৮
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২৮ক. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৯. আশরাফ-উল-আলম টুটু সম্পাদিত, *সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় জনগণের জীবন-জীবিকা*, সিডিপি, খুলনা, জুন, ২০০৪, পৃ. ২৬
৩০. গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩১. K.G.M. Latiful Bari (সম্পাদিত), *Bangladesh District Gazetteers Khulna*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৭৬
৩২. সাক্ষাৎকার, শ্রী মনোরঞ্জন সরকার, গ্রাম ও পো: - সাহেবের আবাদ, উপজেলা- দাকোপ, জেলা- খুলনা, বয়স- ৮২ বছর, শিক্ষা- ১০ম শ্রেণী, পেশা- সঙ্গীত শিল্পী
৩৩. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩৫. K.G.M. Latiful Bari (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৩৬. হরেন্দ্রনাথ রায়, *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ দর্পণ* (অপ্রকাশিত গ্রন্থ), দাকোপ, খুলনা, পৃ. ৩০
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩৮. সাক্ষাৎকার: শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাম ও পো: - চুনকুড়ি, উপজেলা- দাকোপ, জেলা- খুলনা, বয়স- ৫৫ বছর, শিক্ষা- এম.এ, পেশা- শিক্ষকতা
৩৯. সাক্ষাৎকার: শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়, পিতা- স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, গ্রাম- সাতঘরিয়া, পোঃ- কালিনগর, জেলা- খুলনা, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষা- ১০ম শ্রেণী, পেশা- কৃষি
৪০. Shudhangshu Mallick, *The Mundas in the South Western Region of Bangladesh*, Human Right Congress for Bangladesh Minorities, খুলনা, পৃ. ১.
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৪৪. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৪৬
৪৫. গায়ক: নরেন মুণ্ডা, পিতা- ভাদু মুণ্ডা, গ্রাম-কৈখালী, পো: - শৈলখালী, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, বয়স- ৬০ বছর, শিক্ষা- দ্বিতীয় শ্রেণী
৪৬. গায়ক, প্রাগুক্ত

৪৭. গায়ক: চিন্তা মণি, স্বামী- কমল সরদার, গ্রাম- কৈখালী, পো: - শৈলখালী, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, বয়স- ৮০ বছর, শিক্ষা- নিরক্ষর
৪৮. গায়ক, প্রাগুক্ত
৪৯. গায়ক: সবিতা মুণ্ডা, স্বামী- নিরঞ্জন মুণ্ডা, গ্রাম- কৈখালী, পো: - শৈলখালী, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, বয়স- ৩৮ বছর, শিক্ষা- পঞ্চম শ্রেণী
৫০. গায়ক: আহলাদিনী মুণ্ডা, স্বামী- নিখিল মুণ্ডা, গ্রাম- কৈখালী, পো: - শৈলখালী, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, বয়স- ৬৫ বছর, শিক্ষা- দ্বিতীয় শ্রেণী
৫১. গায়ক, প্রাগুক্ত
৫২. আশরাফ-উল-আলম টুটু, *সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় জনগণের জীবন-জীবিকা*, সিডিপি, খুলনা, জুন, ২০০৪, পৃ. ২৫
৫৩. শেখর কান্তি রায়, বাওয়ালীদের পেশার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৬, পৃ. ২৯
৫৪. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং- ১৭/০১/২০০৩
৫৫. শেখর কান্তি রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৫৬. আশরাফ-উল-আলম টুটু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫৭. আতিউর রহমান সম্পাদিত, পরিবেশ পত্র, পুণ্য মধুর ঘরে: খসরু চৌধুরী, বর্ষ- ৮, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ১৪
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫৯. আশরাফ-উল-আলম টুটু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৬২. শশাঙ্ক মণ্ডল, *ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন*, পুনশ্চ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ১১৯
৬৩. সুশান্ত সরকার, অষ্টক, লোসাউক, খুলনা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৪
৬৪. সাক্ষাৎকার: চারুচন্দ্র মণ্ডল, কমল কুঠির, মুন্সিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বয়স- ৬৫ বছর, পেশা- শিক্ষকতা।
৬৫. প্রাগুক্ত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

বৈদিক মন্ত্রসাহিত্যে বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ

শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ*

সারসংক্ষেপ

ভারতের বৈদিক ঋষিরা কয়েক হাজার বছর আগে যেসব সুক্ত বা শ্লোক উচ্চারণ করেন সেগুলো মানব জাতির ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ এবং সভ্যতার বিকাশের উৎকৃষ্ট পন্থা। ঋগ্বেদসহ অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ-সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতির বাহক নয়, বিশ্বসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব বেদে তৎকালীন মানুষের সমাজ-অর্থনীতি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক নিয়ম-কানুন, বাদ্যযন্ত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, ঋগ্বেদ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম। সভ্যতার ঠিক কোন পর্যায়ে বা ঠিক কত বছর আগে মানুষ সঙ্গীত তথা বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলনে সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বেশ কঠিন। তবে, প্রত্যেকটি সৃষ্টিরই একটি নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, বাদ্যযন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। এজন্য ঋগ্বেদ অবলম্বনে বৈদিক যুগের নথিপত্রে আলোচিত বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় তুলে ধরা এ গবেষণা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারের পটভূমি

পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষই একমাত্র মননশীল ও সৃজনশীল। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ নিরন্তর সৃষ্টি সাধনায় নিজেকে মাতিয়ে রেখেছে। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ সঙ্গীত তথা বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলন শুরু করে এবং এ সঙ্গীতের যেমন ইতিহাস আছে তেমনি বাদ্যযন্ত্রসমূহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের ইতিহাসও আছে। এই বিষয়ে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

> মানুষ সেই সুদূর অতীতের অনুন্নত অনুর্বর আদিম যুগ থেকে যাত্রা শুরু করে উপনীত হয়েছে আজ আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত যুগে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস যেমন অনন্ত বিস্তারী মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসও তেমনি অনন্ত বিস্তৃত।[১]

সভ্যতার সূচনা পর্বে মানুষ শিকার বা দৈনন্দিন জীবনের কোন সফল মুহূর্তে অথবা কোন বিশেষ মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দিয়ে উঠেছে হাততালি, যে অনুভূতি ছিল মনের অত্যন্ত গভীরে, তাই ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়েছে। তখন এই শব্দ বা ধ্বনি তাদের বার বার ভাবিয়েছে, এরপর বার বার একই শব্দের প্রতিধ্বনি, পুনঃপ্রতিধ্বনি তাদের মস্তিষ্কে এনে দিয়েছে ছন্দের

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দোলা। একইভাবে এই সামান্যতম উৎস থেকেই ক্রমশ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর সৃষ্টি হয়েছে বিবিধ ছন্দের রূপ। প্রাথমিক পর্যায়ে হাততালি, উরুতে আঘাত ইত্যাদি শরীরবাদ্য। এ ছাড়াও পাথরের সাথে পাথর ঠুকে বা পিটিয়ে বাজানো যায় এরূপ বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, যা সাংগীতিক পরিভাষায় ঘনবাদ্য বা Auto phones নামে পরিচিত। মানুষ এই তালবাদ্যের মধ্যেই নিজের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারত, কেন না কেবল তালবাদ্যেও সহযোগিতায় সংগীত ও নৃত্যের উৎকর্ষ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং তা আরো আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীযুগে মানুষ ক্রমশ চেষ্টা চালিয়েছে ততবাদ্য (String Instrument) শুষির বাদ্য (Aerophonic Instrument) ইত্যাদির সুরোৎসারী বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করে যার ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে বাদ্যযন্ত্রের ভাণ্ডার বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদিক সাহিত্য বিশেষ তাৎপর্যবাহী। শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে বেদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও পৃষ্ঠপোষক বৈদিক সাহিত্য। এই কারণেই ভারতীয় সভ্যতায় বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন ও পবিত্র সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত।[২] বৈদিক সাহিত্যেও সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহুমত লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক ম্যাক্স্ মুলার বৈদিক সাহিত্যের সময়কাল হিসাবে নির্ণয় করেছেন ১০০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ড. এম. উইন্টারনিৎস্-এর মতে ২০০০ অথবা ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ অথবা ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের যুগ নির্ধারণ অমীমাংসিতেই রয়ে গেছে। তথাপি আনুমানিক সময়কাল হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে ১৫০০ খ্রী.পূ.-৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ।

বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস অন্বেষণে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য-ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র বেদ অন্যতম প্রধান উৎস। বেদ কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির রচনা নয় বহু শতাব্দীর সাধনায় গড়ে ওঠা, যুগ যুগান্তরের ভাবধারায় পরিপুষ্ট এক সংকলন গ্রন্থ। যাই হোক, বৈদিক-সাহিত্য বলতে যা বুঝি সেটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত– ১। সংহিতা বা মন্ত্র, ২। ব্রাহ্মণ, ৩। আরণ্যক ও উপনিষদ ।[৩] সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহ। বৈদিক সাহিত্যে সংহিতা চারটি– ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। বৈদিক সাহিত্যে বিচিত্র প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন চর্মবাদ্য অর্থাৎ গঠনগত বিচারে যেগুলি আনদ্ধ শ্রেণীর (Membranophonic Instrument) অন্তর্গত, যেমন– দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি। এ ছাড়া বিভিন্ন তন্ত্রী যুক্ত বাদ্যযন্ত্র তারবাদ্যের (String Instrument) অন্তর্গত, যেমন– বীণা, পিঙ্গ ইত্যাদি। এ ছাড়াও সুষির শ্রেণীর (Aerophonic Instrument) অন্তর্গত বেণু ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে বেদ শাস্ত্রে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

দুন্দুভি

দুন্দুভি'র অপর নাম ঢোল। হাত দিয়ে আঘাত করে বাজাতে হয়। কোনটি কাঠ ও চামড়ার তৈরি। আবার কোনটি মাটি ও চামড়ার তৈরি (ভূমিদুন্দুভি)। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে দুন্দুভির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক যুজ্যসে।

ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ (ঋগ্বেদ- ১/২৮/৫)

অর্থাৎ হে উলূখল ! যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হও, তথাপি এ যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদের দুন্দুভির ন্যায় প্রভুর ধ্বনিযুক্ত শব্দ কর। এ ছাড়া ৬/৪৭/২৯-৩১– তিনটি ঋক্-মন্ত্রে যুদ্ধ দুন্দুভির স্তুতি করা হয়েছে। শত্রুনাশের জন্য দুন্দুভির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈ র্দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ (ঋগ্বেদ-৬/৪৭/২৯)

আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিঃ ষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ

অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা ইত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীলয়স্ব ॥ (ঋগ্বেদ-৬/৪৭/৩০)

আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভি র্বাবদীতি।

সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোইস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ (ঋগ্বেদ-৬/৪৭/৩১)

অর্থাৎ হে দুন্দুভি! তুমি নিজ শব্দ দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত এ অবগত হোক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সাথে সমবেত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে সুদূরে প্রেরণ কর (২৯)। হে দুন্দুভি! তুমি আমাদের শত্রুগণকে রোদন করাও। তুমি আমাদের বল প্রদান কর। তুমি দুর্ধর্ষ শত্রুগণের পীড়াবিধানপূর্বক উচ্চরব কর। হে দুন্দুভি! আমাদের নিকট অনিষ্ট করে যারা আনন্দিত হয় তুমি তাদের দূরীভূত কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ অতএব আমাদের দৃঢ়তা প্রদান কর (৩০)। হে ইন্দ্র! আমাদের এ সমস্ত ধেনুকে প্রতি নিবৃত্ত করে আমাদের নিকট নিয়ে এস। দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করছে। আমাদের নায়কগণ অশ্বারোহণপূর্বক সমবেত হয়েছে। হে ইন্দ্র! আমাদের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে (৩১)।

শুক্লযজুর্বেদেও দুন্দুভির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২/১৭/৫ শুক্লযজুর্বেদে রয়েছে–

নমঃ শ্রতেরপি শ্রুতেরপি চ নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চেতি।

কৃষ্ণযজুর্বেদেও শততন্ত্রী বীণা, দুন্দুভি বা ভূমিদুন্দুভি বাদ্যের উল্লেখ পাওযা যায়। সপ্তম কাণ্ড, পঞ্চম প্রপাঠক, নবম মন্ত্রে–

বাণ: শততন্তুর্ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ... দুন্দুভীন্‌ৎ সমাঘ্নতি... দুন্দুভৌ পরমামেব... ভূমিদুন্দুভিমা ঘ্নন্তি... (৭/৫/৯)

অর্থাৎ নানাদিকে স্থাপিত বড় বড় দুন্দুভিগুলি বাজান হয়। এ দুন্দুভি ধ্বনি অন্যান্য ধ্বনি থেকে অতি উচ্চ ও সভার মনোরঞ্জনের যোগ্য। একশ তন্ত্রী বিশিষ্ট শততন্ত্রী বীণা পুরুষের শতায়ুর প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হত। দুন্দুভির গভীর ও গম্ভীর ধ্বনির কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদেও দুন্দুভির উল্লেখযুক্ত বহু মন্ত্র পাওয়া যায়। এই বেদের পঞ্চম কাণ্ডে দুন্দুভি বাদ্যের উল্লেখ রয়েছে–

উচ্চৈর্ঘোষো দুন্দুভিঃ সত্বনায়ন্‌ বানস্পত্যঃ সম্ভৃত উস্রিয়াভিঃ।
বাচং ক্ষুণুবানো দময়ন্ত্সপত্নান্ত্সিংহ ইব জেষ্যন্নভি তংস্তনীহি ॥ (অথর্ব-৫/৪/৫/১)
দুন্দুভের্বাচং প্রযতাং বদন্তীমাশৃণ্বতী নাথিতা ঘোষবুদ্ধা।
নারী পুত্রং ধাবতু হস্তগৃহ্যামিত্রী ভীতা সমরে বধানাম্‌ ॥ (অথর্ব-৫/৪/৫/৫)
পূর্বো দুন্দুভে প্র বদাসি বাচং ভূম্যাঃ পৃষ্ঠে বদ রোচমানঃ।
আমিত্রসেনামভিজঞ্জভানো দ্যুমদ্‌ বদ দুন্দুভে সূনৃতাবৎ ॥ (অথর্ব-৫/৪/৫/৬)
শ্রেয়ঃকেতো বসুজিৎ সহীয়ান্ত্সংগ্রামজিৎ সংশিতো ব্রহ্মণাশি।

অংশূনিব গ্রাবাধিষবণে অদ্রির্গব্যন্‌ দুন্দুভেইধি নৃত্য বেদ ॥ (অথর্ব-৫/৪/৫/১০)

অর্থাৎ উচ্চৈর্ঘোষঃ ইত্যাদি সুক্তের দ্বারা শত্রুসেনার ত্রাসন, বিদ্বেষণ কর্মে ভেরী প্রভৃতি বাদ্য ধুয়ে তগর উশীরের দ্বারা লেপন করে তিনবার বাজিয়ে পুরোহিত বাদককে দিবে। সেরূপ মহাব্রতে এ সূক্তের দ্বারা ভূমিদুন্দুভির তাড়না করতে হয়। অথর্ববেদে ষষ্ঠ কাণ্ড, চতুর্থ অনুবাক, চতুর্থ সুক্তে চতুর্থ মন্ত্রে দুন্দুভি বাদ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে–

রাজন্যে দুন্দুভাবায়তায়ামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ। (অথর্ব-৬/৪/৪/৪)

অর্থাৎ রাজকুমারে ও তাড্যমান দুন্দুভিতে, অশ্বের শীঘ্রগমনে ও পুরুষের উচ্চ শব্দে যে দীপ্তি আছে, যে সুভগা দেবী ইত্যাদি। এ ছাড়াও দ্বাদশ কাণ্ড, প্রথম অনুবাক, প্রথম সুক্তে একচল্লিশতম মন্ত্রেও দুন্দুভির উল্লেখ পাওয়া যায়–

যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ। (অথর্ব-১২/১/১/৪১)

গর্গর ও পিঙ্গ

ঋগ্বেদে গর্গর, পিঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিস্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্‌ ॥ (ঋগ্বেদ- ৮/৬৯/৯)

অর্থাৎ গর গর ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করছে, গোধা চর্তুদিকে শব্দ করছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর।

অর্থাৎ গর্গর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দোৎপন্নকারী বাদ্যযন্ত্র এবং মনে করা যেতে পারে যে পিঙ্গল বা নীলাভ তাম্রবর্ণের অস্ত্র দিয়ে তৈরী বিশেষ ধরনের ধনুর্যন্ত্র এই পিঙ্গ। এটি রাবণাস্ত্র নামেও পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এই পিঙ্গই ক্রমশ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাহুলীন বা বেহালার রূপ নেয়।

কর্করি

ঋগ্বেদে কর্করি নামক বাদ্যযন্ত্রেরও প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রে আছে–

আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ।

যদুৎপতন্‌বদসি কর্করির্যআ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ (ঋগ্বেদ- ২/৪৩/৩)

রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা অনুবাদে বলেছেন, হে শকুনি! যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। যখন তূষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করে থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির ন্যায় শব্দ করে থাক।... অর্থাৎ এই কর্করি নামক বাদ্যযন্ত্রের শব্দ অনেকটা শকুনির ডাকের মতোই ছিল।

অথর্ববেদেও কর্করি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত যাত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি। (অথর্ব- ৪/৮/২/৫)

অর্থাৎ হে অপ্সরাগণ, তোমাদের ক্রীড়ার জন্য হরিৎ ও ধবলবর্ণ দোলা যেখানে নিবদ্ধ আছে, সেখানে যাও। সেরূপ যেখানে বাদ্যমান কর্করী (বাদ্যবিশেষ) তোমাদের নৃত্যের তালে শব্দ করে, সেখানে আমাদের অলক্ষ্যে যাও, গিয়ে নিরুদ্ধগতি হয়ে থাক।

বীণা

বীণা ধনুকাকৃতির এবং তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। বীণাই হল সবচেয়ে প্রাচীন ভারতীয় তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এর আকৃতি লম্বাটে এবং মাঝখানে ফাঁকা। এর একটি গণ্ডদেশ এবং সরুমাথা আছে। যা কিছুটা বক্র। দেখতে ড্রাগনের মাথার মত। এই যন্ত্রের সাতটি তার আছে। এগুলোর চারটি প্রধান তার গণ্ডদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্য তিনটি তার পাশে পিনের সঙ্গে আটকানো। সুরের ছন্দের জন্য এই তার গুলি ব্যবহার করা হয়। সঙ্গীতকার ভূমিতে বসে ঘাড়ের সাথে রেখে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে। ডান হাতটি প্রধান চারটি তার বাজাতে এবং বাম হাত অন্য তিনটি তার বাজাতে ব্যবহার করে থাকে।

বীণা সম্বন্ধে বেদসহ প্রায় সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভারত বর্ষের অজন্তা মন্দিরে যে-সকল তার সংযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের ছবি আছে বীণা তাদের অন্যতম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অভিমত দিয়েছেন যে, খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকার সভ্য সমাজে বীণার বহুল প্রচলন ছিল।[৪] এই হিসেবে ঋগ্বেদে বীণার উল্লেখ পাওয়া স্বাভাবিক। ঋগ্বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধরনের বীণার প্রচলন ছিল। একটি মন্ত্রে আছে —

ঊর্ধ্বং নুনুদ্রেইবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতম্ ।

ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে ॥ (ঋগ্বেদ- ১/৮৫/১০)

অর্থাৎ মরুৎগণ স্বীয় বল্লারা কুপ উপরে উঠিয়ে পথনিরোধক পর্বতকে বিভেদ করেছিলেন। শোভন দানশীল মরুৎগণ বীণা বাজিয়ে সোমপানে হৃষ্ট হয়ে রমণীয় বন দিয়েছিলেন। বাণ শব্দের অর্থ গলার স্বর (Voice) বুঝিয়েছেন অধ্যাপক ম্যাক্স্ মুলার। অন্যদিকে সায়ণ বলেছেন, বাণ অর্থে শততন্ত্র বীণা যার গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন। এ ছাড়া ১০/৩২/৪ ঋকে আছে–

অদিৎ সধস্থমভি চারু দীধয় গাবো যচ্ছাসন্বহতুং ন ধেনবঃ।

মাতা যন্মন্তর্যূথস্য পূর্ব্যাভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ ॥ (ঋগ্বেদ- ১০/৩২/৪)

অর্থাৎ বাণ অর্থে বীণা ও সপ্তধাতু অর্থে সাত স্বরকে প্রকাশ করছে। ঋষি কাত্যায়ন কর্তৃক সৃষ্ট শততন্ত্রী বীণাই কাত্যায়নী বীণায় পরিণত হয়।

বেণুর উল্লেখও পাওয়া যায়–

শতং বেণূঞ্ছতং শুনঃ শতং চর্মাণি স্লাতানি।

শতং মে বল্বজস্তকা অরুষীণাং চতুঃশতম্ ॥ (ঋগ্বেদ- ৮/৫৫/৩)

অর্থাৎ শতবেণু শতশ্বা শতস্লাত চর্ম শতবল্বজ স্তক এবং চারশত অরুষী রয়েছে। এখানে শতবেণু বলতে শতবীণাকে বুঝানো হয়েছে। উডল্যান্ড তাঁর 'ট্রিটিজ অন দি হিন্দু মিউজিক' গ্রন্থে বীণার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তদানীন্তন কালে এই উপমহাদেশে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল বীণা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ বীণাতে এমন কতগুলো সুর ও গমকের কাজ দেখানো সম্ভব যা নাকি অন্য কোনো যন্ত্রে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, স্যার উইলিয়াম জোন্স্ও তাঁর গ্রন্থে বীণার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মোনিয়ার উলিয়াম্স্ বীণাকে 'লাইয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সংগীতজ্ঞগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বীণা বাদ্যযন্ত্রকে একটি নিখুঁত যন্ত্র বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫]

বক্র

বক্র বীণার একটি ভিন্ন রূপ। অথর্ববেদে চতুর্থ কাণ্ড, দ্বিতীয় অনুবাক, প্রথম সুক্তে চতুর্থ মন্ত্রে বক্র বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়–

যস্ত আস্যৎ পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধি ধন্বনঃ। (অথর্ব- ৪/২/১/৪)

অর্থাৎ পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত যে হস্ত বক্র জ্যাযুক্ত ধনু থেকে পুরুষের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, বিষপ্রদ সে হস্ত ক্রমুক-বৃক্ষের খণ্ডের দ্বারা মন্ত্রের সাহায্যে নির্বীর্য করছি। কারো কারো মতে, এই বাদ্যযন্ত্র ধনুর্যন্ত্র বিশেষ। কিন্তু ধনু যেমন শত্রু বিনাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তেমনি ধনুর জ্যা শত্রু-ত্রাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো– যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন তন্ত্র বাদ্যের আদিরূপ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

বনস্পতি

বনস্পতি নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ অথর্ববেদে রয়েছে দ্বাদশ কাণ্ডে।

বনস্পতিঃ সহ দেবৈর্ন আগন্ রক্ষঃ পিশাচা অপবাধমানঃ। (অথর্ব- ১২/৩/১/১৫)

বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সঙ্গীত সমস্যাসঙ্কুল মানবজীবনে শান্তি এনে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। সঙ্গীত ও মন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ বাস্তব সত্যটি অনুভব করে প্রাচীন ভারতে আর্যরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যবহার করে সঙ্গীত সৃষ্টি ও উপভোগ করেন। তবে, মধ্য ও বর্তমান যুগের বাদ্যযন্ত্রাদির তুলনায় বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্রাদি আকৃতি ও কার্যাবলীর দিক থেকে ভিন্নতর ছিল। উল্লেখ্য যে, বেদ গ্রন্থে এ সবের আকৃতি ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণও অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বীণা।

বৈদিক সাহিত্যে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সংস্কৃতি অনুশীলন মানুষের ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ নান্দনিক আবেদনে রূপান্তরিত হয়ে বিবিধ বিনোদনিক চাহিদা পূরণ করে, তারই ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগ বা সময়কাল অক্ষুণ্ন রেখেছিল। ক্রমোন্নতির এই অনিবার্য ধারা মানব ইতিহাসের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প ক্রমবিকাশের পথকে গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রাচীন যন্ত্র সংগীতের অনুশীলনের মধ্যে প্রোথিত আছে বর্তমান বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব।

ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায়, বেদপরবর্তী যুগে ভরতের নাট্যশাস্ত্র অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য বিষয়ে তখন পর্যন্ত যাবতীয় উদ্ভাবনার তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছিল। লয়-তাল-সমন্বিত গান শুনিয়ে যে বিরোধ বিক্ষোভ প্রশমন করা সম্ভব, সে কথা বিলক্ষণ জানতেন

নাট্যশাস্ত্রকার। এই প্রসঙ্গে ধাতুর সাহায্যে চিত্রবীণায় সুর তুলবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি– ধাতুভিশ্চিত্রবীণায়াং ... প্রযোক্তব্যং বুধৈরথ ॥ (নাট্যশাস্ত্র-৫/৪২)। ষড়জ ইত্যাদি সপ্তস্বর কণ্ঠে কিংবা বীণায় তোলার কথা এখানে আছে। (শারীরাশ্চৈব বৈণাশ্চ- নাট্যশাস্ত্র ৬/২৭)। তত, অবনদ্ধ, খন, সুষির চাররকম আতোদ্য বা বাদ্যযন্ত্রের কথাও এখানে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়ম্ আতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্।

ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়ম্, অবনদ্ধং তু পৌষ্করম্ ॥ (নাট্যশাস্ত্র- ৬/২৮)

খনস্তু তালো বিজ্ঞেয়ঃ, সুষিরো বংশ এব চ। (নাট্যশাস্ত্র- ৬/২৯)

পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে নতুন বাদ্যযন্ত্রেরও হদিস মেলে, বলা বাহুল্য। যেমন, মুসা খাঁর প্রবর্তনায় বঙ্গভূমিতে লেখা শব্দরত্নাবলীতে সানেয়ী (= সানাই), দ্রগড় (= ডগর), ঝঁঝর (=ঝাঁঝর) ইত্যাদি। সে অন্য কথা।

তথ্যনির্দেশ

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা-৭০০০০৬, ২০০০, চতুর্থ সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ-১৯৫৩), তিন খণ্ড, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৭

২. শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস(বৈদিক ও লৌকিক), কলকাতা, আশ্বিন, ১৯৯০, পৃ. ১

৩. ভবেশ রায়, বেদ ও বৈদিক সমাজ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা: এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ২১

৪. মোবারক হোসেন খান, বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ (১৯৯১), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

মূল গ্রন্থ

১. রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ঋগ্বেদসংহিতা, মূল, নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, সদেশ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।

২. রমেশচন্দ্রের দত্তের অনুবাদ, ঋগ্বেদ সংহিতা (প্রথম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভূমিকা, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬) ।

৩. রমেশচন্দ্রের দত্তের অনুবাদ, ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভূমিকা, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬) ।

৪. শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী (অনুবাদ ও সম্পাদনা), অথর্ববেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ ১৪ই আশ্বিন ১৩৮৫) ।

৫. শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী (অনুবাদ ও সম্পাদনা), যজুর্বেদ সংহিতা (শুক্ল ও কৃষ্ণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ ১৪ই আশ্বিন ১৩৮৫)।
৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (অনুবাদ ও সম্পাদনা), ভরতের নাট্যশাস্ত্র, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. রামশরণ শর্মা, (ভাষান্তর সুমন চট্টোপাধ্যায়), প্রাচীন ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪।
২. রোমিলা থাপার (বঙ্গানুবাদ কৃষ্ণা গুপ্তা), ভারতবর্ষের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৮ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮০)।
৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬) ।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

ভারত বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

আনন্দ বিকাশ চাকমা*

সারসংক্ষেপ

১৯৪৬ সালে কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালীসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ভারতে বৃটিশ শাসনকে সংকটাপন্ন করে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার ১৯৪৮-এর ৩০ জুন ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেয়। ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিযুক্তি এ প্রক্রিয়াকে দেয় নতুন গতি। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় এবং কংগ্রেস ও লীগের সম্মতিক্রমে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের টার্ম অব রেফারেন্স বা অনুসরণীয় মূলনীতিমালা তৈরী হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্তির জন্য গঠিত হয় বাউন্ডারী কমিশন। ক্ষমতা হস্তান্তরের এসব কর্মকাণ্ড হিন্দু ও মুসলিমসহ ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও আন্দোলিত করে। বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার সিংহভাগ ছিল উপরোক্ত দুই ধর্মের বাইরে অর্থাৎ বৌদ্ধ। দীর্ঘকাল ধরে আধুনিক ভারতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন এ পশ্চাদপদ জেলার উপজাতীয় রাজাগণ দেশ বিভাগের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি দেশীয় রাজ্যের দাবি করেন। পার্বত্য নেতাদের মধ্যে কিছু অংশ সমকালীন ধর্মকেন্দ্রিক বিভক্তির রাজনীতি সম্যকভাবে অবগত না হয়ে অকস্মাৎ তাদের অমুসলিম পরিচয়কে মুখ্য বিষয় করেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ইউনিয়নে থাকার লক্ষ্যে কংগ্রেসের কাছে তদবির শুরু করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের আশ্বাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্তির সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ১৯৪৭ সাল পূর্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্যকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর আন্তঃসম্পর্ক পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার সাথে রাখার বৃটিশ সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) সঙ্গে রাখার অনুকূল ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপট এবং পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের অমুসলিম পরিচিতিকে ইস্যু করে ভারত ইউনিয়নে থাকার পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিসমূহের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত রেগুলেশন জেলা চট্টগ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত প্রায় সাত হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে বৃটিশরা ১৮৬০ সালে 'Chittagong Hill Tracts' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামে একটি নতুন জেলা সৃষ্টি করে। তারা ১৮৭৪ সালে Scheduled Districts Act, 1874, Act No. XIV of 1874 আইন পাস করে বৃটিশ ভারতের অধীন

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

কতকগুলো অনগ্রসর জেলার তালিকা প্রণয়ন করে। এ রকম তফশিলভুক্ত জেলা ও সাধারণ জেলা মিলে মোট ২৫০টি জেলা প্রশাসন ছিল বৃটিশ ভারতীয় প্রশাসনের মূল ভিত্তি।[১] তফশিলভুক্ত কোন কোন জেলা বা অঞ্চলের প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ছিল, কোন কোনটির ছিল না। অর্থাৎ বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে যেখানে যে রকম কৌশল দরকার সেভাবে তাদের প্রশাসন সাজিয়েছিল। তবে তারা দেশীয় রাজানুগত শ্রেণী সবক্ষেত্রে কমবেশি পেয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল সে রকম একটি তফশিলভুক্ত জেলা। বাংলা প্রদেশের সীমান্তবর্তী এ জেলার প্রশাসনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে তারা সমগ্র জেলাটিকে তিনটি রাজস্ব সার্কেলে ভাগ করে ১১টি উপজাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী তিনজন উপজাতীয় নেতাকে রাজা বা চীফ হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করে। এ তিন রাজা বা চীফ রাজস্ব ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বিভিন্ন ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বৃটিশ শাসন আশু অবসানের সংবাদে ভারতের অন্যান্য অধিবাসীর মত তারাও তাদের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। এর সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যের বড় বড় বৃক্ষতলে যে-রকম ছোট ছোট গাছ-গাছালি বেড়ে ওঠে, ঠিক সে-রকম প্রভাবশালী রাজাদের দাপটের তলে তলে ফাঁক দিয়ে পাহাড়ে গজিয়ে ওঠে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী। রাজাদের মত তারাও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ শাসন নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের সামনে দুটি বিকল্প — কংগ্রেসের ভারত ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান। এর মধ্যে তারা ভারতকেই বেছে নেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ইউনিয়নে রাখতে পার্বত্য নেতাদের (মূলত চাকমা) গৃহীত রাজনৈতিক উদ্যোগের যৌক্তিকতা ও সে প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকা এবং পূর্ব বাংলার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংযুক্ত রাখার অনুকূল আর্থ-সামাজিক দিকগুলো পর্যালোচনা করা হবে।

ভারত বিভক্তির সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল বহু বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর। স্বাধীনতার জন্য তারা পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ। কিন্তু স্বাধীনতা ধরা দেয় বিভক্ত রূপে। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ পাওয়া যায়নি। কারণ মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে তাদের অস্তিত্বকে হুমকি স্বরূপ মনে করে পাকিস্তান নামে নতুন ভূখণ্ডের দাবিতে অনড় ছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের জন্য এটাই ছিল অমোঘ পরিণতি। এ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির অন্যতম কারণ হল কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করেও মুসলমান জনতাকে জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনতে পারেনি। এ ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৪৫ ও ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের সংরক্ষিত মুসলমান আসনের ৯০ শতাংশ বিজয়ের মাধ্যমে।[২] এর সাথে যুক্ত হয় ১৯৪৬-এর আগস্টের কোলকাতা,

নোয়াখালী ও বিহারে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এমনি বাস্তবতায় ভারতীয়দের জন্য বিভক্ত স্বাধীনতার মিশ্র স্বাদ আস্বাদন করা ছাড়া বিকল্প ছিল না। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর ভারতের শাসনব্যবস্থা কী রকম হবে তা নিয়ে বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। কংগ্রেস সরকারিভাবে দেশভাগের কথা উল্লেখ করল ১৯৪৭-এর মার্চের গোড়ার দিকে। ঐ বছরের ৮ মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব পাস করে বলল দেশ যদি ভাগ হয় তাহলে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করতে হবে।[৩] এ রকম পরিস্থিতিতেই ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন এবং ২৪ মার্চ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে বৃটিশদের সুস্পষ্ট ভারত ছাড়ার মিশন নিয়ে এসেছিলেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে '৩রা জুন পরিকল্পনা' নামে একটি দেশ বিভক্তির ফর্মূলা তুলে ধরেন কংগ্রেস ও লীগের সামনে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ফর্মূলা ছিল ভারত ভাগ কর কিন্তু যতটা সম্ভব ঐক্য বজায় রাখ। দেশভাগ হবে, সেই সঙ্গে ভাগ হবে পাঞ্জাব ও বাংলা। ফলে যে সীমিত পাকিস্তানের উদ্ভব হবে তাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের দাবি কিছুটা পরিমাণে মেনে নেওয়া হবে। এতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী পূরণ করা হবে। আবার কংগ্রেসের ইউনিটি বা ঐক্যের ধারণা মেনে নিয়ে পাকিস্তানকে করতে হবে যথাসম্ভব ছোট।[৪] স্বাধীনতাপাগল কংগ্রেস ও লীগ গলাধঃকরণ করল মাউন্টব্যাটেনের টোপ। কংগ্রেস লীগের পাকিস্তান দাবির কাছে নতি স্বীকার করল ১৯৪৭-এর ১৫ জুনে '৩রা জুন পরিকল্পনা' অনুযায়ী দেশ ভাগ মেনে নিয়ে। এমনি প্রেক্ষাপটেই ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টে সকালে প্রকাশ পেল স্বাধীনতা ও দেশভাগের দ্বৈত বাস্তবতা।

ভারত বিভাগ ও চাকমা নেতৃত্বের ভারত ইউনিয়নে থাকার রাজনৈতিক উদ্যোগ

দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি হয় তার ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামকেও নাড়া দেয়। জাতির ক্রান্তিলগ্নে নেতাগণ জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে সুচিন্তিত, সুবিবেচিত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেবেন এটাই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে-কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ জন্য রাজনীতিক নেতাদের হতে হয় অভিজ্ঞতায় ঝানু, উদ্ভূত পরিস্থিতির পূর্বাপর বিশ্লেষণে প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন, সর্বোপরি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। দেশবিভাগ তাই চাকমা নেতাদের সম্মুখে বিরাট চ্যালেঞ্জ বা অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৪৬ সালে শেষের দিকে দেশ-বিভাগকে কেন্দ্র করে চাকমা রাজা এবং শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জেগে ওঠে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজার নেতৃত্বের পাশাপাশি ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর চাকমা নেতাদের পরিচালিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। বৃটিশদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এবং রাজা ভুবনমোহন রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বহু ত্যাগ

তিতিক্ষা স্বীকার করে ১৯১৬ সালে কামিনী মোহন দেওয়ান(১৮৯০-১৯৭৬ খৃঃ) এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫] প্রথম দিকে এ সংগঠনের রাজনৈতিক চেতনা তেমন তীব্র ছিল না। স্থানীয় অভাব অভিযোগ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ ছিল এর কার্যক্রম। ১৯৩৯ সালে স্নেহকুমার চাকমা ও যামিনী রঞ্জন দেওয়ান 'জন সমিতি'তে যোগ দিলে এতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬] দেশবিভাগ নিয়ে তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা ও *জন সমিতির* সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁদের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন:

> দ্বিতীয় জার্মান যুদ্ধ অবসানের পর, স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ বহুকাল পূর্ব হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট, অপরিসীম ত্যাগ ও অকাতরে জীবন উৎসর্গের পরে ও যুদ্ধ অবসানেও আশান্বিত প্রতিশ্রুত ফল লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, তখন সমগ্র ভারতের বিক্ষুব্ধ জনতা নবউদ্যোগে তড়িৎশক্তি প্রবাহতুল্য বিপুল প্রেরণার জীবন পথে পুনঃ উদ্বেলিত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার স্থির সংকল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করিতেছিল। তখন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট জনতার অনমনীয় প্রেরণা অস্ত্রবলে গতিরোধ করার সম্ভাবনা না দেখিয়া, তাহার চিরাচরিত নীতিও স্বভাব মতে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির অঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করিল। এই ঘোষণার বাণী শুনিয়া, এই পার্বত্য জাতিদের মনেও এক নতুন চিন্তা ও নতুন প্রেরণার ভাব জাগিয়া উঠিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও এক সময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম। ... অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষা কল্পে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।[৭]

সর্বভারতীয় রাজনীতির হাল চাল সর্ম্পকে তাঁর মূল্যায়ন এবং স্বজাতির তথা চাকমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ সত্যিই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটিশ ধাঁচের *সাংবিধানিক রাজতন্ত্র* প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) ভ্রমণ করে তৎকালীন কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আচার্য কৃপালিনী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ বাহাদুর, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডুর সাথে মতবিনিময় করেছিলেন।[৮] কিন্তু তিনি যে *জন সমিতির* সভাপতি সেটি ছিল গুটি কয়েক শিক্ষিত লোকের রাংগামাটি-কেন্দ্রিক গোপন সংগঠন। তিনি বা তাঁর সংগঠনের সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অংশে যেমন চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না তেমনি তিন সার্কেলে তিন চীফের আধিপত্যও ছিল অপ্রতিরোধ্য। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ শাসন কাঠামোর রূপরেখার দাবী নিয়ে দলটির নেতৃত্বও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। দলের সেক্রেটারি ও উগ্রপন্থী বলে পরিচিত স্নেহকুমার চাকমার দাবী ছিল

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সভাপতি ও মডারেট শাখার নেতা কামিনী দেওয়ানের দাবী ছিল বৃটিশ ধাঁচের সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক শাসন। অর্থাৎ তিন চীফ হবেন তিন ভৌগোলিক সার্কেলের প্রধান কিন্তু নির্বাহী কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে একটি নির্বাচিত পরিষদের (পার্লামেন্টে) ওপর। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় কামিনী দেওয়ানের প্রস্তাবিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের স্বরূপটি সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন:

> He [Kamini Dewan] believed in constitutional monarchy, that is, the three chiefs should be heads of their territories but executive authority would vest in an elected council (parliament). His dream was an autonomous Hill Tracts too, only the form was at variance with the chiefs, in some details.[৯]

কিন্তু কামিনী দেওয়ানের নেতৃত্ব এবং সংগঠনের প্রতি রাজাদের সমর্থন ছিল না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্ব স্ব সার্কেলে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা আদায় ও ভারত ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকার জন্য কংগ্রেসের কাছে তদবির করার লক্ষ্যে রাজাদের চিন্তায় একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে অনুভূত হয়। এর ফল হিসেবে, অনেকটা তড়িঘড়ি করে ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারীতে তাঁদেরই উদ্যোগে 'পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘ' বা 'চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস হিলম্যান এসোসিয়েশন' নামে একটি স্বল্পায়ু সমিতি (পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এর কার্যক্রম শেষ হয়) জন্মলাভ করে।[১০] নবগঠিত হিলম্যান এসোসিয়েশনটি *জন সমিতি'র* পাল্টা দল হিসেবে নিজেদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে দাবী করে। হিলম্যান এসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও রাজা নলিনাক্ষ রায়ের ভ্রাতা কুমার কোকনদাক্ষ রায় তাঁর লেখাতে তেমনটিই দাবী করেছেন:

> ... আজ এই পাহাড়ী গণসঙ্ঘ সমস্ত ভারতে সুপরিচিত – এই সঙ্ঘ নিজের সত্যের বলে – ভারতের বুকে স্থান করে নিয়েছে। সমস্ত পাহাড়ী জাতি এর জন্য আজ গর্ব্ব অনুভব করে। গঠনকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই পাহাড়ী সঙ্ঘ ভারতের নেতাদের কাছে দৃঢ় স্বরে প্রকাশ করেছে পাহাড়ীজাতির স্বপ্ন কী – জাতির দাবি কী এবং পাহাড়ী সঙ্ঘের দাবী সত্যের উপর স্থাপিত – ন্যায়ের উপর স্থাপিত – সমস্ত ভারতের নেতাদের যা চমৎকৃত করেছে। জগতের দায়িত্বশীল শাসনই এই পাহাড়ী সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম স্বপ্ন – আমাদের মাতৃভূমির সমস্ত শাসনভার জাতীয় রাজাসহ একযোগে সম্পূর্ণ মিলনের সূত্রে আমাদের পার্ব্বত্য চট্টলাকে আমরা রক্ষা করব।[১১]

তাঁর লেখার মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশীয় রাজ্যের মর্যাদাসহ ভারতে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দল সক্রিয় ছিল এবং যারা দাবি আদায়ে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে এককভাবে দাবী পূরণের কৃতিত্ব নিতে অধিক তৎপর ছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তি নিয়ে উভয় সমিতির দ্বিধাবিভক্ত প্রচেষ্টা কংগ্রেস

নেতৃত্বের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি বললেও অত্যুক্তি হয়না। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা যথাক্রমে চাকমা রাজা নলীনাক্ষ রায় (১৯৩৫-১৯৫১ খৃঃ), সিদ্ধার্থ চাকমা ও তার দেখাদেখি আফতাব আহমেদ উভয়ে ভুলবশত ভুবন মোহন রায়ের কথা লিখেছেন, বস্তুতঃ চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় ১৯৩৪ সালে প্রয়াত হন — মং সার্কেল চীফ রাণী নানুমা (১৯২৯-৫৩ খৃঃ) ও বোমাং রাজা ক্যজ সাঁই (১৯৩৩-১৯৫৯ খৃঃ) বরাবরই তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলেন উদ্বিগ্ন এবং যাঁরা গোটা বৃটিশ আমলে বৃটিশদের দেয়া বিচ্ছিন্নতার (এক্সক্লুডেড এরিয়ার) মধ্যেই নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত মনে করতেন, তাঁরা ১৯৪৭-এ এসেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বলা বাহুল্য, যখনই বৃটিশ ভারতে বড় ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগ এসেছে তখনি তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার প্রাদেশিক শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বৃটিশদের কাছে ধরনা দিয়েছেন।[১২] ভারতবর্ষ এবং বাংলা থেকে রাজাদের বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষজ্ঞ Wolfgang Mey-এর লেখায়। তিনি ভারত বিভাগপূর্ব পার্বত্য রাজাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন:

> এইভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা ভারতবর্ষ এবং বাংলা থেকে নিজেদের 'বিচ্ছিন্ন' ভাবতে শুরু করেন। একই সঙ্গে চীফরা বৃটিশ প্রশাসকদের কাছে তাদের অবদান তুলে ধরেন। চীফরা নিজেদের নাগা, লুসাই বা চিনদের থেকে আলাদা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও তাঁরা নিজেদের স্বায়ত্বশাসন বজায় রেখে 'চাকমা স্টেট' (Chakma State), বমং স্টেট (Bomong State) এবং মং স্টেট (Mong State) মিলিত হয়ে ত্রিপুরা ও কোচবিহারের মতো ইস্টার্ন স্টেট এজেন্সি (Eastern State Agency) গঠন করতে চান। চীফরা হবেন তাঁদের স্ব স্ব সার্কেলের সাংবিধানিক শাসক (Constitutional Rulers); স্টেট কাউন্সিল (State council) দ্বারা সমর্থিত হয়ে তাঁরা দায়িত্বশীল মন্ত্রী মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হবেন। স্টেট কাউন্সিলের সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এইভাবে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে চললেই ভবিষ্যতে পাহাড়ে শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকবে। চীফত্রয় আরো চাইলেন যে তাদের সাংবিধানিক তিনরাজ্য (চাকমা, বমং, মং রাজ্য) প্রতিবেশি রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর, কোচবিহার এবং খাসি রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সম্মিলিত যুক্তরাজ্য (Confederation) তৈরী করতে পারে। এই যুক্তরাজ্য কেন্দ্রীয়শাসনের অধীনে থাকবে এবং শাসকদের কাজ হবে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা।[১৩]

এভাবে চীফরা তাঁদের শাসনাধীন সার্কেলগুলোতে তিনটি দেশীয় রাজ্যের (যথা: চাকমা রাজ্য, বোমাং রাজ্য, মং রাজ্য) মর্যাদা দাবী করলেন। তাঁদের দেশীয় রাজ্যের প্রকৃতিও কামিনী মোহন দেওয়ানের প্রস্তাবিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রায় সমরূপ। চীফদের পরিচালিত সংগঠন অর্থাৎ *হিলম্যান এসোসিয়েশন* ১৯৪৭-এর ৪ঠা এপ্রিল রাঙামাটিতে আগত ভারতের গণপরিষদের (কংগ্রেসের) এ্যাডভাইজারি সাবকমিটির[১৪] কাছে নিম্নোক্ত দাবিনামা উপস্থাপন করেছিল:

> জাতীয় তিনজন রাজাসহ প্রজা দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রী মন্ডলীর সাহায্যে দেশের শাসন কার্য চলবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলকে চাকমা, বোমাং এবং মং রাষ্ট্র বলেই মেনে নিতে হবে— এই রাষ্ট্রগুলো একযোগে দেশের শাসনভার চালাবে এবং শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোই ছেড়ে দেবে— আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত ভার থাকবে জাতীয় রাজা এবং জাতীয় মন্ত্রীসভার উপর।[১৫]

রাজাদের হয়ে 'হিলম্যান এসোসিয়েশন' কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের কাছে উক্ত দাবির কথা দৃঢ় স্বরে ব্যক্ত করে। কিন্তু সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামের খাসিয়া অংশ নিয়ে কনফেডারেশন[১৬] গড়তে রাজনৈতিক লবিং করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে নবগঠিত *হিলম্যান এসোসিয়েশন*-এর সভাপতি অবনী রঞ্জন দেওয়ানকে দিল্লী প্রেরণ করেন। কামিনী দেওয়ানের মত তিনিও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে রাখার জন্য দিল্লীতে গিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সাথে দেখা করেছেন। এ প্রসঙ্গে দিল্লীস্থ *Indian News Chronicle* লিখেছিল:

> The Chittagong tribesmen's point of view has been forcefully put forward by Mr. Joypal Singh the Adibasi spokesman in the Constituent Assembly. His advocacy is now strengthened by the support of Mr. Abani Ranjan Dewan, President, Chittagong Hill Tracts Hillman Association who is in Delhi and has met Acharya Kripalani, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad and others and has given them an idea of the agitation caused among the hill tribes.[১৭]

কিন্তু প্রশ্ন হল *জন সমিতির* নেতা কামিনী দেওয়ান, স্নেহকুমার চাকমা এবং রাজাদের সংগঠন 'হিলম্যান এসোসিয়েশন' কর্তৃক ভারত ইউনিয়নের সাথে থাকার দাবি কী সুচিন্তিত ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত ছিল? ভারত-ভুক্তির পক্ষে প্রচলিত কিছু যুক্তির ভিত্তি আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, হিলম্যান এসোসিয়েশন যখন তিনটি দেশীয় রাজ্যের দাবি উত্থাপন করল তখন বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। দেশীয় রাজ্যেগুলোকে যেনতেন ভাবে টিকিয়ে রেখে সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করা ছিল বৃটিশ নীতি, কংগ্রেসের নয়। বৃটিশ শাসন অবসানের সাথে সাথে দেশীয় রাজ্যগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। আর যে-সব দেশীয় রাজ্য ভারত ইউনিয়নে যোগ দিতে গড়িমসি করেছে মোদ্দা কথায় কংগ্রেসের অঙ্গুলি হেলনে সোজা হয়নি তাদেরকে কংগ্রেস সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পথে এনেছে। এ ক্ষেত্রে হায়দ্রাবাদ বড় দৃষ্টান্ত। পার্বত্য রাজাদের দেশীয় রাজ্যের দাবি যতটা ছিল আবেগনির্ভর (তাদের মতে, হিন্দুদের জন্য হিন্দু রাজ্য, মুসলিদের জন্য মুসলিম রাজ্য, শিখদের জন্য শিখরাজ্য যদি সম্ভব হয় তাহলে চাকমাদের জন্য চাকমা রাজ্য, মারমাদের জন্য মারমা রাজ্যও সম্ভব)

ততটা ছিল কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্যে অনুসৃত নীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ — সেকেলে। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাস, আয়তন, জনসংখ্যা, তিন রাজার আধিপত্য বৃটিশ ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলোর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আয়তন ও জনসংখ্যার দিকে তাকালে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-এ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে যে আদমশুমারী রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ২,৮৭,৬৮৮ জন। এর মধ্যে চাকমা: ১,২৪,৭৬২ জন; মারমা: ৬৫,৮৮৯ জন; ত্রিপুরা: ৩৭,২৪৬ জন; তঞ্চঙ্গ্যা: ৮,৩১৩ জন; কুকি ১,৯৭২ জন; লুসাই: ১,৩৬৯ জন।[১৮] সুতরাং, চার বছর আগে জনসংখ্যার এ হার নিশ্চিতভাবে আরো কম ছিল এবং হংকংস্থ *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউর* মতে, তখন পাহাড়ী জনসংখ্যা ছিল ২৫০,০০০ জন, হিন্দু ২৬০০০ এবং মুসলমান ২০০০ জন।[১৯] রাজাদের বা *হিলম্যান এসোসিয়েশনের* দাবি অনুযায়ী ধরে নেই: পার্বত্য চট্টগ্রামের ১,২৪,৭৬২ জন চাকমা অধ্যুষিত ২৪২১ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট চাকমা সার্কেল নিয়ে চাকমা রাজ্য গঠিত হল, তাহলে মাত্র ২০৬৪ বর্গমাইল ও ৬৫৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট যথাক্রমে বোমাং ও মং সার্কেল নিয়ে একই নৃতাত্তিক গোষ্ঠীর মাত্র ৬৫,৮৮৯ জন মারমা জনসংখ্যা নিয়ে দুটি দেশীয় রাজ্য মেনে নেওয়া অসম্ভব না হলেও অসংগত। মং সার্কেলে মারমার চেয়ে ত্রিপুরা জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেশি। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩৭,২৪৬ জন ত্রিপুরা জনগোষ্ঠি নিয়েও তো আরেকটি ত্রিপুরা রাজ্য গঠন করতে হয়? পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দুর্গম, অনগ্রসর, স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত জেলাকে নিয়ে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীমণ্ডলী সমেত তিনটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দাবি ছিল কালবিরুদ্ধ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ আদিত্যকুমার দেওয়ানের মতে:

> পার্বত্য জেলার সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর অধিবাসীদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও নৃতাত্ত্বিক ভাবে ঘনিষ্ঠতার কারণে চাকমা নেতৃবৃন্দ ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন।[২০]

কিন্তু তিনি পূর্ব বাংলার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, স্মরণাতীত কাল থেকে চট্টগ্রামের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগকে আমলে আনেননি। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার সরকারী ভাষা বাংলা, অধিবাসীরা ধর্মে অধিকাংশ হিন্দু এবং মিজোরামের ভাষা মিজো, ধর্ম প্রাকৃতিক ও খৃষ্টান। লুসাইদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা ভাষার কোন সাদৃশ্য নেই। আসামের অহমী ভাষার সাথে চাকমা ভাষার কিছুটা মিল থাকলেও এটা গবেষণা পুস্তকের পাতা পর্যন্ত। Wolfgang Mey-এর লেখাতেই উল্লেখ রয়েছে পার্বত্য চীফত্রয় নিজেদেরকে নাগা ও লুসাই থেকে আলাদা প্রমাণে সচেষ্ট। (১২নং তথ্যনির্দেশ দ্রষ্টব্য)

তৃতীয়ত, লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এন্টি-স্লেইভারি সোসাইটির রিপোর্ট মতে,

> For many Chakmas and other Buddhist tribes people, the fear of the religious persecution under an Islamic Pakistan led them to opt for India as Buddhism clearly has more religious and social affinities with Hinduism.[২১]

সংস্থার পরিবেশিত তথ্যানুসারে তৎকালীন চাকমা এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অন্যান্য উপজাতি যদি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত-করণের আশংকায় ভারতভুক্তিকে অধিকতর শ্রেয় মনে করে থাকে তবে বলতে হবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না। কেননা, ১৯৪৭-এর ১৪ অগাস্ট সরকারিভাবে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার দিনকয়েক পূর্বে ১১ অগাস্টে পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এম. এ. জিন্নাহ দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি নতুন রাষ্ট্রের নীতি প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য:

> You are free. You are free to go to your temples; you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed --- that has nothing to do with the business of the state. ... We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ... Now I think that we should keep it as our ideal and in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state.[২২]

জিন্নাহর শেষ স্বপ্ন ছিল অসাম্প্রদায়িক আধুনিক গণতান্ত্রিক পাকিস্তান। যাহোক, পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে কিংবা এর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন অমুসলিম উপজাতিকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখালঘুদের প্রতি হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব ছিল বৈরী।[২৩]

এ-সব তথ্য হয়ত তৎকালীন পার্বত্য নেতাদের জানা ছিল না। এ-সব তথ্য জানা থাকলে তারা ভারতমুখী হতেন না। রিলিজিয়াস পারসিকিউশন বা জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরের হুমকি হিন্দু ধর্মেও কম ছিল না। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের যৎসামান্য নৈকট্য থাকতে পারে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল থেরবাদী বৌদ্ধযান যা মহাযান বিরোধী। শুধু তা নয়, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ছিল শুধুমাত্র রাজদরবারকেন্দ্রিক। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিলেও প্রত্যন্ত সামাজিক পরিমণ্ডলে এ ধর্মের প্রভাব ও অনুশীলন একেবারেই শূন্য। বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে এক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা লিখেছেন:

> আমার এখনো মনে পড়ে তৎপূর্বে আমি বুদ্ধমূর্তি দেখি নাই, বুদ্ধের ছবিও দেখি নাই। তাই ভয়ে ভয়ে বড় ভাইদের পিছন পিছন চললাম । প্রায় এক মাইল হেঁটে আমরা মাটির তৈরী

> গুদাম ঘরে ঢুকলাম। আমাদের বড় ভাই দলাকানা সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে,"খবর দার, গোলমাল করিও না। ভক্তিভরে জোড় হাত দেখিয়ে এভাবে বুদ্ধকে প্রণাম করবে"। মন্দিরের ভিতরে আমরা প্রথম দেখলাম মানুষের মত তৈরী একটি মূর্তি বসে আছে। এ মূর্তিটি পদ্মাসনে বসা, তাঁর একটা হাত কোলে অন্য হাত হাঁটুর উপর। আমাদের বড় ভাই দলাকানা দেখিয়ে দিলেন, "ইনিই হলেন সেই বুদ্ধ।"[২৪]

চতুর্থত, নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন যেমন– চাকমা চীফ নলীনাক্ষ রায় ও অপর দুই রাজা, জন সমিতি সেক্রেটারি স্নেহকুমার চাকমা ও সভাপতি কামিনীমোহন দেওয়ান প্রমুখ ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগে প্রয়াসী হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক সিদ্ধার্থ চাকমার মতে:

> এই সংগঠনটির নামের সাথে অসাম্প্রদায়িক লেবেল আঁটা ছিল বলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল কংগ্রেসের প্রতি এবং ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবার প্রবল ইচ্ছাও।[২৫]

কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে শুধু চাকমারা নয় মুসলিম সম্প্রদায়ও ছিল সংখ্যালঘু। কংগ্রেস যদি ভারতের সকল সংখ্যালঘুর স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল হত তাহলে চাকমাদের চেয়ে শতগুণে সচেতন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত না হয়ে পৃথক সংগঠন *মুসলিম লীগ* গঠন করতো না। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসে উচ্চ পর্যায়ে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেসের ওপর ভরসা করতে পারেনি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আধুনিক মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমদ এ সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন। তাঁর মতে:

> কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ভারত শাসন করা; এবং যদিও তারা ভারতের আপামর জনগণের নামে শাসন করতে ইচ্ছুক, তারপরও মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যালঘু সে শাসনে তারা হবে অসহায়।

আর. সি. মজুমদারের কথায়:

> In short, Syed Ahmad looked upon the Congress as a machinery devised by the Hindus to further their own interests at the cost of the Muslims. Hence we find an insistent opposition to the Congress from Syed Ahmad and his school.[২৬]

কংগ্রেস সম্পর্কে পরবর্তী সময়ের মুসলিম পত্রপত্রিকার একই রকমের মূল্যায়ন আরও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে:

> কংগ্রেস একটা হিন্দু সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। এর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা হল মুসলমানদের ধ্বংস করার হিন্দু মনোবৃত্তির অন্য এক অভিব্যক্তি ... সারা ভারতে হিন্দু কংগ্রেসবাদী, স্বরাজবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদীরা (রিভাইভ্যালিস্ট) ভারত থেকে

> মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছে তা চরম বিপজ্জনক...সুতরাং মুসলমানেরা যদি তাদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায্য লড়াই না করে ... কেউ তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না।[২৭]

১৯৪৬-এর অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮ অগাস্ট তারিখে জিন্নাহ বলেছিলেন:

> বর্ণ হিন্দুদের ফ্যাসিস্ট সংগঠন 'কংগ্রেস' চায় 'বৃটিশ বেয়নেটের সাহায্যে ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করতে ও তাদের শাসন করতে।[২৮]

সুতরাং, সংখ্যালঘুদের কাছে কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ। ১৯৪৭-এ কংগ্রেসের কাছে ধর্মীয় পরিচয় অতটা মুখ্য ছিলনা যতটা ছিল দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর বা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। এমতাবস্থায় অমুসলিম ও অহিন্দু চাকমাদের ভারতে অন্তর্ভুক্তির পেছনে কংগ্রেসের দৃষ্টি দেয়ার মত বিশেষ কোন স্বার্থ ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম না ছিল অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, না ছিল বিপুল সংখ্যক ভোটার-অধ্যুষিত (২,৫০,০০০ জন), না ছিল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত, তবে ভু-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ত্রিদেশীয় সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির নেতাদের দাবির মধ্যে যেমন ঐক্য ছিলনা তেমনি চাকমা ও মারমা রাজাদেরও ছিল পৃথক স্বার্থচিন্তা। সুতরাং, এ রকম রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংগঠনের গায়ে কেবলমাত্র অসাম্প্রদায়িক লেবেল আঁটার যুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ইউনিয়নে রাখার জন্য চাকমা নেতাদের কংগ্রেসের কাছে রাজনৈতিক লবিং বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সম্ভবত এ কারণে কংগ্রেসের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ইউনিয়নে যুক্ত করার জন্য নেতৃবৃন্দের আকুতি কেবল আকুতিই থেকে গেছে। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা এপ্রিলে কেবলমাত্র কংগ্রেসের একটা প্রতিনিধিদলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ছাড়া চাকমা নেতৃবৃন্দ বিনিময়ে কিছুই পায়নি। তাদের প্রত্যাশিত দেশীয় রাজ্যও পায়নি; আবার ফেডারেশনও নয়, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রও নয় কিংবা জনগণের শাসন বা গণতন্ত্রও না। পেয়েছিল কংগ্রেসী উদাসীনতা, অনেকের মতে কংগ্রেসী বেঈমানী।[২৯] কিন্তু তৎকালীন নেতাদের এ বোধটির উদয় হয়নি যে তখন উপমহাদেশের পরস্পর চিরবৈরী দুই সংগঠনের মধ্যে কোনটির প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করা মানে অন্যটির রোষানলে পড়া। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত গবেষক আমেনা মহসিন যথার্থই লিখেছেন,

> Unable to identify with the politics of the Muslim League, the Hill people– 95 percent non-Muslim – sought assistance from the secular Congress. Chakma elites approached Congressional leaders and appealed for the merger of the CHT with the Indian Union.[৩০]

সর্বশেষ, ভারতে অন্তর্ভুক্তির পেছনে পার্বত্য নেতাদের প্রচলিত আরেকটা যুক্তি হল ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ৯৮.৫ ভাগ ছিল অমুসলিম। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। যথা: বৌদ্ধ ছিল ৮৫.৫%, ত্রিপুরা হিন্দু ১০%, এ্যানিমিস্ট ৩%, মুসলিম ১.৫%, আবার জাতিগত পরিসংখ্যান মতে, পার্বত্য উপজাতি ৯৭.৫% এবং সমতল থেকে আগত হিন্দু, মুসলিম ও বড়ুয়া ২.৫%।[৩১] তাই তারা ভারতে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হল ধর্মীয় দিক দিয়ে চাকমা ও মারমারা অমুসলিম ঠিকই, পরোক্ষভাবে অহিন্দুও বটে। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিতে সিংহভাগ চাকমা ও মারমা বৌদ্ধ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা ছিল না; যেহেতু হিন্দু নেতারা পার্বত্য নেতাদের বৌদ্ধ পরিচয়টিকে গুরুত্বই দেয়নি। এ জন্য দীর্ঘদীন ভারতের মিজোরাম প্রদেশে কর্মরত চাকমা আমলা এস. পি. তালুকদার আক্ষেপ করে লিখেছেন:

> Surprisingly this just and weighty claim of the tribal Buddhists did not cause much concern to the Hindu leaders either and as such no voice was raised by them against this arbitrary decision of annexation of CHT to Pakistan without providing any opportunity to its inhabitants to give their option.[৩২]

পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত রাজা ত্রিদিব রায় লিখেছেন:

> Raja Nalinaksha and the other two Rajas and the Hillmen's Association wanted independence as three self-geverning States and a loose association with the neighbouring native State of Tripura.[৩৩]

রাজাদের মধ্যে চাকমা রাজা যা করেন বলা যায় সেটাই অন্য দুই রাজা অনুসরণ করেন। সুতরাং, চাকমা রাজার ভারতে থাকার দাবীর ভিত্তি নিয়ে অনুমান করা যায়। তিনি হিন্দু না হলেও ভারতের ব্রাহ্ম হিন্দু কেশবচন্দ্র পরিবারের সাথে সাত পাকে বাঁধা। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের স্ত্রী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার সরল সেনের শিক্ষিতা কন্যা বিনীতা দেবী, যিনি বিয়ের পরে বিনীতা রায় নামে সমধিক পরিচিত হন। সুতরাং, সুশিক্ষিতা হিন্দু বংশোদ্ভূত স্ত্রীর প্রভাবে বা স্বীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধরে রাখার উদ্দেশ্যে রাজা ভারতভুক্তি চাইতে পারেন। অন্তত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ত্রিদিব রায়ের অবস্থান নির্ধারণে তাঁর স্ত্রী রাণী আরতি রায়ের প্রভাব ছিল বলে এক বিশিষ্ট প্রবীণ আমলা ও চাকমা লেখক দাবী করেছেন।[৩৪] তাঁর আর এক ভাই বিরূপাক্ষ রায়ের সাথে কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুরের জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার ডাঃ ভবেন্দ্র নারায়ণ, কুমিল্লার সিভিল সার্জন ও রাজকুমারী তিলোত্তমা পরিবারের কন্যা সুধীরা নারায়ণের সাথে বৈবাহিক ও

পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুতরাং রাজার কুচবিহারের সাথে কনফেডারেশন গড়তে চাওয়ার এটিও একটি সূত্র বৈকি।[৩৫] বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস বৈবাহিক সম্বন্ধকে পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টান্তে ভরপুর (মৌর্য, গুপ্ত, মুঘল, বুরবোঁ, হ্যাপসবার্গ প্রভৃতি রাজবংশ)। এছাড়া দেওয়ানদের সাথেও হিন্দুদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

অন্যদিকে চাকমাদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় থাকার মত যথেষ্ট অনুকূল আর্থ-সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। ১৭৩৭ সালে আরাকান ফেরত চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁকে মুসলিম মোগলরাই জমিদারী দিয়েছিলেন (জান বক্স খাঁ পর্যন্ত চাকমা রাজারা নিজেদের জমিদার বলেই পরিচয় দিতেন, হরিশ্চন্দ্র প্রথম রাজা উপাধি পান) এবং চাকমা সমাজে যে দেওয়ান পদবী তা মুঘলদেরই সৃষ্ট পদবী যা চাকমা রাজা তাঁর প্রশাসনে প্রয়োগ করেন। আর রাজাদের খাঁ উপাধি গ্রহণ মুঘল সম্রাটদের সাথে তাদের সুসম্পর্কের ইঙ্গিতবহ। অষ্টাদশ শতকে বেশ কয়েকজন চাকমা রাজা মুসলমান নাম গ্রহণ করেছেন। চাকমা ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সম্পর্কও বিরোধার্থক ছিল না। চাকমা রাজারা পার্সী ভাষায় মুদ্রা জারি করতেন। সতীশচন্দ্র ঘোষ পার্সীতে উৎকীর্ণ আটটি মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি মুদ্রায় 'আল্লা হু রাব্বী' খোদিত ছিল বলে তিনি দাবী করেছেন।[৩৬] এতে রাজাদের মোগলদের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরো বৃটিশ আমলে চট্টগ্রামের মুসলমানদের সাথে পার্বত্য উপজাতিদের ছিল সম্প্রীতির সম্পর্ক। ১৮১৮ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁর (১৮১২-১৮৩২ খৃঃ) উদ্যোগে হালকৃষি পদ্ধতি চাকমাদের মধ্যে পরিচিত করার জন্য রাঙ্গুনীয়া থেকে কয়েকটি মুসলমান পরিবারকে ডেকে রাঙামাটিতে (কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাড়ে) বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। সে সময়ে রাজার 'হাইল্যাচাষী' হিসেবে আগতদের মধ্যে রাংগুনিয়ার আহসাব উদ্দিন, কাজী আলীমুদ্দিন, সাতকানিয়ার আতর আলীর নাম জানা যায়। তারা সেখানে একটি গ্রাম গড়ে তোলে। গ্রামটির নাম শিলপৈতাং। এটি ছিল কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাড়ের উর্বর পলিযুক্ত একটি সোনা ফলানো ধানী জমির গ্রাম।[৩৭] চাকমাদের কাছে যেটি *পুরান বস্তি* নামে পরিচিত। রাণী কালিন্দি ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ও (১৮৭৪-১৮৮৩ খৃঃ) রাঙ্গুনীয়া জমিদারী এলাকা থেকে বাঙালি মুসলমানদেরকে রাঙামাটিতে নিয়ে আসা অব্যাহত ছিল। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন ১৮৬৬ সালে ১৫ এপ্রিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein* নামক গ্রন্থে ৬ বছর পূর্ব থেকে কর্ণফুলী নদীর তীরে ১২০টি বাঙালি পরিবার এনে হাল চাষ প্রক্রিয়া শুরু করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ সময়ে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের পাড়া *'নতুন বস্তি'* নামে পরিচিত।

এভাবে রাজবাড়ীর সন্নিকটে শিলপৈতাং, কচুনালা ও সিঙ্গিনালায় গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম।[৩৮] কালক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং চাকমাদের সাথে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪১ সালে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী কালিরতন খীসা তখনকার সাম্প্রদায়িক সর্ম্পক প্রসঙ্গে বলেন:

> তখন তাদের সাথে (বাঙালিদের) একাত্ম হয়ে এক এলাকায় এক গোষ্ঠীর মানুষের মত চলাফেরা করতাম। আনন্দ উৎসব ভাগাভাগি করে নিতাম।[৩৯]

রাঙামাটির বিশিষ্ট নাগরিক সুবিমল দেওয়ানের মতে —

> তখন বলি খেলা হতো খুব। পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা চলতো। চট্টগ্রাম থেকে বাঙ্গালীরা খেলতে আসতো। নজরুলরা (রাঙামাটির সিংগিনালার বাসিন্দা, কাজী নজরুল ইসলাম) খেলতো পাহাড়ীদের পক্ষে। ওরাও এক রকম পাহাড়ী ছিলো।[৪০]

রাজপরিবারের সাথেও মুসলমানদের সুসম্পর্ক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাবেক রাজা ত্রিদিব রায় কৈশোরে মুসলমানদের সাথে তাঁদের সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> On Muslim festivals, Eid for instance, the matbars (leaders) of Puranbasti, the oldest Muslim settlement in the Hill Tracts, grown from the nucleus brought in by Maharaja Dharam Bux from his lands in Rangunea, would bring us meat and sweets.[৪১]

বোমাং রাজারাও মুসলমানদের রাজ কার্যালয়ে নিয়োগ করতেন। বোমাং রাজা কংহ্লা প্রুর অধীনে প্রচুর মুসলমান চাকরী করতেন। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক বৃটিশ রাজকর্মচারী ফ্রান্সিস বুকানন- এর ভ্রমণ বিবরণী থেকে নিম্নরূপ তথ্য জানা যায়:

> The proper appellation for this Chief is Po-mang Kaung-la Pru. Po-mang is his title, and signifies Captain. Kaung-la is his proper name; and Pru, which signifies white, is the name of the family. ... He has about twenty Hindu Servants, and still more Mohammedans, his Dewan or Minister being of that religion.[৪২]

মুসলমানরা রাজানুগত্যের নিদর্শন হিসেবে রাজবাড়িতে মিষ্টি, মাংস ইত্যাদি পাঠাত। সাধারণ চাকমা প্রতিবেশীরা তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতো। চাকমা রাণী কালিন্দীও (১৮৪৪-৭৩ খৃঃ) মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তিনি চাকমা রাজ্যের তৎকালীন রাজধানীর রাজভবনের (রাংগুনীয়ার রাজা নগর) সম্মুখে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে প্রতিদিন নিয়মিত আযান এবং সন্ধ্যার সময়ে প্রদীপ দিতে একজন বিশুদ্ধাচারী খন্দকার নিযুক্ত করেছিলেন। প্রতি জুমার দিন অর্থাৎ শুক্রবার খন্দকার, মৌলবী, কাজী প্রভৃতিকে আহ্বান করে বাইরের ঘরে আধ মণ দুগ্ধের পায়সান্ন রান্না করে খোদার নামে নিবেদনান্তর অনেক মুসলমানকে খাওয়াতেন। এতদ্ভিন্ন নানা স্থানে মসজিদের

সাহায্যার্থে রাজসরকার থেকে অর্থ প্রদান করেছেন।[৪৩] এটি রাণীর পরধর্মের প্রতি উদারতার পরিচায়ক। কালিন্দি রাণীর সময়েই চাকমা সমাজে 'সত্যপীরের সিন্নি' খ্যাত মুসলমানী আচার প্রবেশ করেছে[৪৪] এবং বিংশ শতকের নব্বই দশকেও এ সিন্নি পূজা (চাকমারা সিন্দি বলে) গ্রামাঞ্চলে হরহামেশা দেখা যেত। [লেখক নিজেও এ সিন্নির প্রসাদ খেয়েছে এবং নিজ পরিবারে করতে দেখেছে]। উল্লেখ্য, শনি বা মঙ্গলবারে পাঁচ পোয়া চাউলের আটা, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মস্ত একছড়া কলা প্রভৃতি উপচারের মিশ্রণে এ পূজা স্থাপন করা হয়। অতঃপর প্রতিবেশীগণ উপস্থিত হলে সকলে ভক্তি ভরে প্রণতি বা পাঞ্চালি পাঠ করে এবং উপচার সমূহ একত্রে মাখিয়ে 'সিন্নি' প্রস্তুত করে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, চাকমা সমাজে মুসলিম আচার প্রথারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সতীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন:

> এই সময়ে তাহাদের (চাকমাদের) কুলবধূগণেরও 'বিবি'– রাণীদের নাম আটকবিবি, হারিবিবি, চিকণবিবি প্রভৃতি– খেতাব প্রচলিত ছিল। এখনও অশিক্ষিত সাধারণে 'সালাম' শব্দে অভিবাদন করে এবং আশ্চর্য বা খেদসুচক আবেগে 'খোদা'র নাম স্মরণ করিয়া থাকে।[৪৫]

এটিও গত শতক পর্যন্ত চাকমা গ্রাম-সমাজে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, রামগড়, বান্দরবান বাজারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও কয়েকটি বাজারে মুসলমানদের দোকান ছিল। রাঙামাটিতে মনছব আলীদের ছিল লঞ্চের ব্যবসা, ছল্যা সওদাগরের মুদির দোকান, আলী আহমদ সওদাগরের হোটেল ব্যবসা, কাজী আবদুল কুদ্দস মাস্টারের বন্দুক ও গোলাবারুদের দোকান। এ ছাড়া ছোট-বড় ১৫-২০টি শুটকির দোকানী ছিল মুসলমান।[৪৬] খাগড়াছড়ি বাজারে গুরামিয়া, বাদশামিয়াসহ আরও কয়েকজন দোকানী পরিবার নিয়ে থাকতেন। গুরামিয়ার খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে কিছু কৃষি জমিও ছিল। বৃটিশ আমলে সমগ্র বঙ্গদেশে অনেকবার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার পর সমগ্র প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন দাঙ্গা হয়নি। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই সদ্ভাব ছিল।[৪৭] চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথেও চাকমা ভাষার অনেক মিল। চাকমারা সহজেই চট্টগ্রামের বাঙালিদের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ করতে পারত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও চাকমারা সেই মুঘল আমল থেকে চট্টগামের ওপরই নির্ভরশীল।[৪৮] সমতলের বাঙালিদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে অর্থনৈতিক প্রভাব প্রসঙ্গে রাজকুমারী চন্দ্রা রায় লিখেছেন:

> However, there were economic factors involved in the relationship between the two neighbours as raw products from the hill tracts such as timber, cotton, sesame, sungrass and bamboo found a ready market in the plains, while the indigenous hill people needed utensils, salt and kerosene, which were not available in their area.[৪৯]

সুদীর্ঘকাল ধরে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায় চাকমা রাজাদের রাজধানী ছিল। রাজানগরের মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির ও মং রাজার পাহাড়তলী মহামুনি বৌদ্ধ মন্দিরে আয়োজিত বৌদ্ধ মেলা পাহাড়ী-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উৎসবমুখর পরিবেশে উপভোগ করত। বাঙালিরা মেলায় বাহারী দ্রব্যের পসরা সাজিয়ে বসত আর পাহাড়ীরা সেখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত।[৫০] অর্থাৎ চট্টগ্রামের বাঙালিদের সাথে চাকমাদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক বিরাজমান ছিল। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে পার্বত্য রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য বিষয় ছিল না। সুতরাং পূর্ব বাংলার নেতাদের মাধ্যমে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে সমঝোতা না করে কংগ্রেসের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে পাকিস্তানভুক্তির বিরোধিতা করা ছিল তৎকালীন চাকমা নেতাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অপরিপক্কতার পরিচায়ক।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে চেয়ারম্যান করে ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন গঠিত বেঙ্গল বাউন্ডারী কমিশন[৫১] বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহের কাছ থেকে প্রতিনিধি এবং স্মারকলিপি আহ্বান করে। ১৯৪৭ সালের ১৬ থেকে ২৪ জুলাই কমিশন কোলকাতার বেলভেডিয়া প্রাসাদে সভা আহ্বান করে। কংগ্রেস প্রথম দিনেই তার স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে ৪০,১৩৭ বর্গমাইলের ২,৮০,৩২,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলাকে ভারতভুক্তির দাবী করা হয়। মজার বিষয় হল পার্বত্য নেতাদের এত কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও কংগ্রেস তার উপস্থাপিত স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায়ও আনেনি যেটা করেছিল কোলকাতাকে রক্ষার ক্ষেত্রে।[৫২] কংগ্রেস তার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পৃথক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দাবিকে জোরালো করার জন্য উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এ বিষয়টি সমসাময়িক একটি ইংরেজী পত্রিকা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছিল। পত্রিকাটি লিখেছিল:

> Bitter resentment is expressed by representatives of the Chittagong Hill Tracts area against the decision over to that territory to East Bengal. The resentment is not so much against Sir Cyril Radcliffe as against the Congress, which in its memorandum presented the Boundary Commission took the initiative in making the offer of the area to Pakistan.[৫৩]

বলা হয়ে থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে কংগ্রেস গোপনে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু এ প্রচেষ্টা গোপনে চালাবার বিষয় ছিল না। যা-হোক এ প্রসঙ্গে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৯৪৭-এর ১৩ অগাস্ট তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়:

> I have told them [The CHT Tribes] that the proposition was so monstrous that if it should happen they would be justified in resisting to

> the utmost of their power and count on our maximum support in such resistance'... he thought it `inconceivable that such a blatant breach of the terms of reference should be perpetrated'. 'Any award against the weight of local opinion and of the terms of reference, or without any referendum to ascertain the will of the people concerned, must, therefore, be construed as a collusive or partisan award and will therefore have to be repudiated by us.[৫৪]

কিন্তু তাঁর এ চিঠিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুব একটা মূল্য দিয়েছেন বলে মনে হয়না। কারণ, এর কয়েকদিন পর লন্ডনের উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি সরদার প্যাটেলকে মানসিক বিকারগ্রস্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

> The one man I had regarded as a real statesman with both feet firmly on the ground, and a man of honour whose word was his bond, had turned out to be as hysterical as the rest. … So much for his undertaking on behalf of India to accept and implement the awards whatever they might be.[৫৫]

এর মাধ্যমে তিনি সরদার প্যাটেলকে দেশ বিভাগের 'টার্ম অব রেফারেন্সের' কথাও মনে করিয়ে দেন। কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লীগ ১৭ জুলাই ১৯৪৭ এ তার দাখিলকৃত স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে রাখার কথা দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করে। জানা যায় তারা অষ্টাদশ শতকে চাকমা রাজাদের খাঁ উপাধি গ্রহণকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেছিল। শেষ হাসি তারাই হেসেছিল—পাকিস্তান পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছিল।[৫৬]

১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে বলে সরকারী ভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে রাখার লক্ষ্যে *জন সমিতির* সাধারণ সম্পাদক স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে একদল চাকমা (ঘনশ্যাম দেওয়ান, ললিত মোহন চাকমা, স্রোত রঞ্জন খীসা, রবীন্দ্রলাল চাকমা ও অন্যান্য) কংগ্রেস-এর (সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল)[৫৭] আশ্বাসে রাঙামাটির ডিসি কার্যালয়ের সামনে ভারতের পতাকা উড়িয়ে[৫৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি প্রতিহত করতে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিল ১৯৪৭-এর চৌদ্দ মতান্তরে পনেরই আগস্ট। আফতাব আহমেদ-এর লেখায় প্রতিরোধের একটি চিত্র পাওয়া যায়:

> The pro-Indian faction of the Jana Samiti formed Protirod (Resistance) Squads under the overall supervision of a Sangram (Action) Committee headed by Sneha Kumar Chakma to resist the installation of Pakistani administration. In an emotionally charged emergency meeting held on 19 August 1947 the pro-Indian elements of the CHT called for an uprising and armed resistance against the Pakistani authorities. The meeting also adopted a resolution which amongst other things declared that `the CHT shall not abide by the Radcliffe Award.[৫৯]

এ প্রসঙ্গে এস পি তালুকদার লিখেছেন:

> Some inhabitants of CHT ... Ghansyam Dewan, Sneh Kumar Chakma, Lalit Mohan Chakma, Sroto Ranjan Khisha, Rabindra lal Chakma and others felt uneasy at the announcement of this annexation and rose in revolt against this declaration.[৬০]

অন্যদিকে বান্দরবানে বর্মী বংশোদ্ভূত রাজপরিবারের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা বার্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় উড়িয়ে দেয় বার্মার পতাকা। তাদের এই পতাকা মাত্র এক সপ্তাহ উড়তে পেরেছিল। ২১ অগাস্ট পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্ট চট্টগ্রাম থেকে এসে উভয় স্থানে উড্ডীন ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কামিনী দেওয়ান, 'একগুঁয়েমী ও ভাবাবেগপ্রাপ্ত উন্মাদনা' বলে আখ্যায়িত করে তা থেকে বিরত থাকার জন্য স্নেহকুমারকে বুঝিয়েও ব্যর্থ হন। তিনি বলেছিলেন,

> আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক, ভ্রান্ত ও অনিশ্চিত আশায় প্রলুব্ধ হইয়া এইরূপ অন্যায় ও অবিবেচকমূলক কার্য্যের দ্বারা পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের সন্দেহ ও অবিশ্বাসীরূপে তাহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অপ্রিয়ভাজন হওয়া কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।[৬১]

এ অবস্থায় তিনি *পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির* সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। কিন্তু স্নেহকুমার দমবার পাত্র ছিলেন না। যুক্তি ও বাস্তবতা থেকে উপজাতীয় গোঁয়ার প্রকৃতি তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। পাকিস্তান যখন বেলুচ রেজিমেন্টের সেনা দিয়ে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা নেয় তখন স্নেহকুমার চাকমা তার সহযোগীদের নিয়ে (হৃদয় রঞ্জন চাকমা, ঘনশ্যাম দেওয়ান, দারোগা ইন্দ্রমনি চাকমা, স্রোত রঞ্জন খীসা, মোহন লাল চাকমা, সুনীতি জীবন চাকমা প্রমুখ) ভারতের ত্রিপুরায় পালিয়ে যান। তখন না রাজা, না নেতা কেউ মুসলিম লীগ বা জিন্নাহর কাছে আসল পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেননি। তারা যদি বলতেন যে স্নেহকুমার যা করেছেন তা সমগ্র চাকমা জাতি তথা পার্বত্যবাসীর মত নয়, আপামর পার্বত্যবাসীর পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে আপত্তি নেই এবং তারা সবাই পাকিস্তানকে মেনে নিয়েছে, তখন হয়ত চাকমাদের প্রতি পাকিস্তানের মনোভাব সহানুভূতিশীল হতে পারত। কিন্তু যা হয়েছিল তাহল এই যে, দু'-একজন অতি উৎসাহী, অপরিণামদর্শী রাজনীতিকের অদূরদর্শিতার কারণে পুরো জাতিকে পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত থাকতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব বাংলায় অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে কুমার কোকনদাক্ষ রায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃতযোগ্য:

> বর্ত্তমান যুদ্ধের [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ] পর সমগ্র ভারতে শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবেই। কিন্তু এ নব শাসন ব্যবস্থার পরেও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম আর বর্ত্তমানের 'Excluded Area' রূপ শাসন ব্যবস্থা চায় না কারণ এই শাসন ব্যবস্থা আমাদের উন্নতির দিকে না নিয়ে অবনতির দিকে নিয়ে গেছে— যদি কোন কারণে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বা State-এ [চাকমা স্টেট, মং স্টেট, বোমাং স্টেট] পরিণত না করে বর্ত্তমানের 'Excluded Area' রূপ শাসন ব্যবস্থা রেখে পূর্ব্ব সীমান্তের নাগাপর্বত, লুসাইপর্বত এবং চীনপর্বতের সঙ্গে সীমাবদ্ধ

করে— বৃহত্তর 'Excluded Area' রাজ্যে পরিণত করে; সেক্ষেত্রে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালাদেশের শাসন ব্যবস্থার অধীনে যাওয়ায় মঙ্গল,— আমাদের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য আমরা বাঙ্গালাদেশের সঙ্গেই স্থাপিত করব তাতে যদি আমাদের সমস্ত জাতিই লুপ্ত হয়ে যায় তবুও 'Excluded Area' রূপ শাসন ব্যবস্থা অপেক্ষা সুখে থাকব এবং বঙ্গদেশের শাসনব্যবস্থা আমাদের মঙ্গলের হবে।[৬২]

তথ্যনির্দেশ

1. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteeth Century.* (London: Cambridge University Press, Paperback edition), ১৯৭১, পৃ. ৪
2. মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবিকে মুখ্য ইস্যু করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বৃটিশ ভারতের প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহের ৪৮২টি আসনের মধ্যে ৪২৩টি আসনে জয় লাভ করে। এর মধ্যে বাংলার ফলাফল ছিল পাকিস্তান গঠনের পক্ষে সুস্পষ্ট রায়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ বঙ্গীয় আইন সভায় ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
3. Vapal Pangunni Menon, *The Transfer of Power in India* (Chennai: 1957), পৃ. ৩৪৭ & R. C. Majumdar (ed.) *History of The Freedom Movement in India,* Vol. III (Calcutta: 2nd Revised Edition, 196), পৃ. ৬৫৬
4. Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar, Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence: 1857-1947* (New Delhi: Penguin Books, ১৯৮৯); সুনীল মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* ১৮৫৭-১৯৪৭, কলকাতা: কে পি বাগচি এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪, পৃ. ৪২৬
5. কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী* (রাংগামাটি: সরোজ আর্ট প্রেস) ১৯৭০, পৃ. ১১৭; কামিনী মোহন দেওয়ান ছিলেন এ সমিতির কর্ম কমিটির সভাপতি এবং প্রধান প্রাণপুরুষ। তিনি এ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও বার্তা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর কথায়, "আমি নিজে বহু টাকা ব্যয় করিয়া আমার বাড়িতে এক জনসভার আহ্বান করিলাম। নির্দিষ্ট দিবসে বহুদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় মৃতকল্প জাতীয় জীবনে নব জীবন সঞ্চারের পক্ষে এই অভিনব উপায়ের ব্যাখা করে বুঝানো হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে তখনই সভাস্থলে সমিতির উদ্দেশ্য ও বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া জন সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করা হইল এবং সকলকে সমিতির মেম্বার শ্রেণীভুক্ত করিয়া কার্যকমিটির মেম্বারগণকেও ঐ সভায় নির্বাচিত করা হইয়াছিল। সকলের সম্মতিক্রমে ঐ সভায় আমাকে প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করা হইয়াছিল।"
6. প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ২১
7. কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪৯- ৫০
8. *ঐ,* আরো দেখুন, Sakya Prasad Talukdar, *The Chakmas: Life and Struggle* (New Delhi: Gyan publishing House), ১৯৮৮, পৃ. ৪৭
9. Raja Tridiv Roy, *The Departed Melody* (Islamabad: PPA Publications), ২০০৩, পৃ. ১৪৯

10. কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম.এ. 'পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ সঙ্ঘ'' *গৈরিকা,* ১২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩১। *গৈরিকা* চাকমা রাণী বিনীতা রায়ের পরিচালনায় এবং আরুণ রায়ের সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, এটি ১৯৩৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।
11. *প্রাগুক্ত,* ৪৩২; তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে পাহাড়ী গণ সঙ্ঘ তার কার্যক্রম শুরু করে: (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণীর পাহাড়ী জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় দাবী পূরণার্থে স্বাধীন ভারতের নুতন শাসন ব্যবস্থা অনুসারে শাসনকার্যে পূর্ণাধিকার লাভ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমতানুসারে তিন সার্কেলের রাজাসহ শাসনকার্য্য পরিচালনা; (২) পাহাড়ী গণের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জাতীয় রীতিনীতি সংরক্ষণ; (৩) পাহাড়ী জাতির সর্ব প্রকার উন্নতিমূলক পন্থা অবলম্বন।
12. পাহাড়ী সামন্ত নেতৃত্ব পূর্ববাংলা থেকে বা ভারতের মূল স্রোত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখাটাই নিজের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করেছিল। এ ধরনের প্রচেষ্টা তারা ১৯৩৫ সালে বিখ্যাত ভারত শাসন আইন প্রর্বতনের প্রাক্কালেও করেছিল। এখানে ১৯৩১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবের বরাবরে রাজাদের প্রেরিত অপ্রকাশিত স্মারকলিপি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি। এ স্মারকলিপির কপি শ্রীবিজয়কেতন চাকমা আমার হাতে তুলে দেন।

    a) Under any scheme of Provincial autonomy the newly formed Bengal Legislative Council and Cabinet of Ministers may be debarred by Statue to exercise any authority direct or indirect over these three Chiefs and the tracts under their charge; b) The entire area (CHT) might be placed under the direct control of the Government of India founctioning through an accredited agent; c) All powers of collection of taxes, whether from `plough land' or `jum', and all civil and criminal authority inside their areas may be fully exercised without let or hindrance, by the Chiefs.
13. Wolfgang E. Mey, *Politische Systeme in den Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* জার্মানি, ১৯৮০। স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী), (অনু:) *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ : একটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস* (কলিকাতা: আইসিবিএস, ফার্মা কেএলএম প্রা: লি: , ১৯৯৬), পৃ. ৯০-৯১
14. ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল এ ভি টক্কর-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা উপযোগি তা খতিয়ে দেখা ও হাইকমান্ডের কাছে রিপোর্ট করার ভার নিয়ে রাঙামাটি সফর করেন। এ দলে আরো ছিলেন ডা: প্রফুল্ল ঘোষ, জয়পাল সিংহ, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা ও জয়প্রকাশ নারায়ণ। কমিটি স্থানীয়দের মধ্য থেকে স্নেহকুমার ও ঘনশ্যাম দেওয়ানকে কো-অপ্ট করে। আর অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কামিনী মোহন দেওয়ান।
15. কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম. এ. 'পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ সঙ্ঘ'' *গৈরিকা,* ১২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩১
16. K. Roy, `India's Mongolian Fringe' in *Statesman*, June 23, 1947. আরো দেখুন, Aggabongsha Mahatera, *Stop Genocide in Chittagong Hill Tracts,* (Calcutta: 1981), 3 Cited in Siddhartha Chakma, *Prasanga: Parbatyo Chattagram*, (Calcutta: Nath Brothers, 1986), 12 & Julian Berger & Alan Whittaker (ed.), *The Chittagong Hill Tracts: Militarization, Opression and the Hill Tribes,* Anti–Slavery Society, Indigenous Peoples and Development Series, Report No. 2 (London: 1984, hereafter Anti-Slavery Society) পৃ. ৪৫

17. *Indian News Chronicle*, New Delhi, রবিবার, আগস্ট ২৪, ১৯৪৭
18. Muhammad Ishaq (ed.), *Bangaldesh Districts Gazetteers: Chittagong Hill Tracts.* ঢাকা, কেবিনেট মন্ত্রণালয়, এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন, ১৯৭১, পৃ. ৪৪
19. Bertil Lintner, ``Tribal Turmoil'', *Far Eastern Economic Review,* 5 April 1990. This report appeared in Khaled Belal (ed.), *The Chittagong Hill Tracts: Falconry in the Hills,* চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ১৩৬
20. Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh (*Ph.D. thesis, Canada: McGill University), ১৯৯০, পৃ. ১৭৮
21. Anti-Slavery Society, পৃ. ৪৫
22. Jamil-Ud-din Ahmed (ed.), *Speeches and Writings of Mr Jinnah* (Vol. 2, Lahore), ১৯৬৪, পৃ. ৪০৩-৪০৪
23. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর. এস. এস.) প্রধান এম. এস. গোলওয়ালকর-এর উক্তি থেকে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়: ''হিন্দুস্থানের অহিন্দুদের হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে ও এ ধর্মের মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে লালন করতে শিখতে হবে। হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির মহিমা কীর্তন করা ছাড়া অন্য কোন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না ... না হয় তারা এদেশে থাকতে পারবেন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতির হুকুমের দাস হয়ে। কোন কিছু দাবি করতে পারবেন না। পারবেন না কোন সুযোগ সুবিধা চাইতে। কোন বিশেষ সুবিধার তো প্রশ্নই উঠে না। নাগরিক অধিকার পর্যন্ত পাবেন না।'' M S Golwalkar, *We or Our Nationhood Defined,* নাগপুর: ১৯৪৭, পৃ. ৫৮, উদ্ধৃত: সুনীল মুখোপাধ্যায় (অনু:), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* পৃ. ৩৭২
24. ইন্দ্রলাল চাকমা, ''বুদ্ধ দর্শনে প্রথম'', বিধুর ভিক্ষু (সম্পা), *বনভন্তের জন্মস্মারক '১১* (রাংগামাটি: রাজবন বিহার), ২০১১, পৃ. ৩৪-৩৬
25. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ: পার্বত্য চট্টগ্রাম,* কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৬, পৃ. ৭
26. R. C. Majumdar**,** *History of the Freedom Movement in India,* কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩০
27. Joya Chatterjee, *Bengal Divided*: *Hindu Communalism and Partition 1932-1947,* Cambridge : Cambrige University Press, 1994, (অনু:) আবু জাফর, *বাংলা ভাগ হল,* ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩২
28. সুনীল মুখোপাধ্যায়,(অনু:) *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭০
29. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪
30. Amena Mohsin, *The Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: On the Difficult Road to Peace,* London, ২০০৩, পৃ. ১৭
31. Mukur K. Khisha, *Time and Again,* New Delhi, ২০০৪, পৃ. ১৮০
32. Sakya Prasad Talukdar, *The Chakmas: Life and Struggle,* New Delhi: ১৯৮৮, পৃ. ৪৮
33. Raja Tridiv Roy, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯১
34. শরদিন্দু শেখর চাকমা, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম,* ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩৫; তিনি রাজমাতা বিনীতা রায়ের কাছ থেকে জেনেছেন রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাণী আরতি রায়ের অনীহার কারণে যাওয়া হয়নি।

35. Raja Tridiv Roy, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৪, এখানে লক্ষণীয় যে, কুচবিহার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। দেশভাগের সময় কুচ-বিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্বয়ং পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক ছিলেন। দেখুন, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, *আমার শিল্পী জীবনের কথা,* ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭৭-৭৮
36. সতীশচন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতি,* প্রথম প্রকাশ, রাঙামাটি, ১৯০৯; ২০০৯ সালে পুনঃপ্রকাশিত, পৃ. ৬৯
37. আজাদ বুলবুল, *স্বপ্নভ্রষ্টা কাপ্তাই বাঁধ,* ঢাকা, মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৩৬
38. ঐ, পৃ. ৩৬,৭২, ১০৯
39. ঐ, পৃ. ২২
40. ঐ, পৃ. ৩২
41. Raja Tridiv Roy, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৪
42. Willem van Schendel (ed.), *Francis Buchanan in Southeast Bengal,* ১৯৭৮, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮৯
43. সতীশ ঘোষ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১১
44. ঐ, পৃ. ১৮৫
45. ঐ, পৃ. ৬
46. আজাদ বুলবুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
47. এস. এস. চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম একাল সেকাল,* ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭
48. দেখুন, A.M. Serajuddin, ``The Chakma tribe of the Chittagong Hill Tracts in the 18th century'', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,* খণ্ড ১, ১৯৮৪, পৃ. ৯০-৯৮
49. Raj Kumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous Peoples of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh* (Copenhegen: IWGIA Doc. No.99), ২০০০, পৃ. ৩৯
50. Captain Thomas Herbert Lewin, *Wild Races of South-Eastern India*, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, পৃ. ৬২
51. H.V. Hodson, *The Great Divide : Britain-India-Pakistan,* করাচি, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪৭
52. Aftab Ahmed, ``Ethnicity and Insurgency in the Chittagong Hill Tracts Region: A study of the Crisis of Political Integration in Bangladesh,'' *Journal of the Commonwealth and Comparative Politics*, খণ্ড ৩১, নং ৩, ১৯৯৩, পৃ. ৩২-৬৬
53. *Indian News Chronicle*, New Delhi, রবিবার, ২৪ আগস্ট, ১৯৪৭
54. H.V. Hodson, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০
55. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০
56. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, ১৩; দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর কলকাতায় আহূত এক জনসভার ভাষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "Gross injustice had been done with regard to the Chittagong Hill Tracts. He also declared that the matter would be taken up with Pakistan or in an international court. See, M K Khisa, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১, কিন্তু পরে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি।

57. সর্দার প্যাটেলের দ্ব্যার্থক প্রতিশ্রুতি চাকমা বুদ্ধিজীবীদের এত নাড়া দেয় যে তা তাদের উপন্যাসের চরিত্রে সংলাপ হিসেবে উপজীব্য করে তোলেন। ভারতের সাবেক কূটনীতিক ও রাষ্ট্রদূত মুকুর কান্তি খীসা তাঁর *'All that Glisters'* গ্রন্থে মোহিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন:
'With a deep sigh full of pathos Mohit Chakma lamented, "There was no one to listen to our appeal or Champion our cause. We sent a delegation of our leaders to New Delhi to plead our cause. They were received by Sardar Patel who gave a sympathetic hearing and advised them to resist with all their might. He did not hesitate to tell the members of the delegation, 'At the moment my hands are too full with Kashmir, Hyderabad and Junagadh. Once these problems are solved, I assure you categorically that I will come to your rescue.'' পৃ. ৫১; ১৯৪৭-৪৮ সালে ত্রিবাঙ্কুর, জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ—এ-সব দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তির ব্যাপারে যিনি অন্য যে কোন লোকের চেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি নিজে রাজা-মহারাজাদের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের প্রবীণ যোদ্ধা সর্দার প্যাটেল। তাঁর নির্দেশনায় ১৯৪৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজামের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে প্রবেশ করে নিজামকে ১৮ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে রাজ্যটি ভারত ইউনিয়নভুক্ত করে। তাঁর প্রতিশ্রুতিতে স্নেহকুমাররা ভারতের পতাকা তুলে যে বিদ্রোহ করল এবং ২১ আগস্ট পাকিস্তানী বাহিনী এসে তা দমন করল। কিন্তু প্যাটেলের উদ্ধারকারী বাহিনী তো হিল ট্র্যাক্টে আসেনি!
58. চাকমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে পতাকা ওড়ানো নতুন নয়। অষ্টাদশ শতকেও (১৭৭৬-৮৭) তৎকালীন চাকমা রাজা শের দৌলত খাঁর নায়েব রনু খাঁও নিশান উড়িয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং নিজ রাজার সার্বভৌম রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সাহসী বীর চাকমা রাজা শের দৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ ও তাদের সেনাপতি দেওয়ান রনু খাঁ, কনু খাঁ, ডুলুপ, চোরি, ঠুটঠ্যাংরা সর্বস্তরের চাকমাদের নিয়ে গভীর দেশপ্রেম ও বীরত্বের সাথে বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াই করলেও শেষ পর্যায়ে বৃটিশরা চাকমাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করলে চাকমাদেরকে তীব্র দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ পরিস্থিতিতে রাজা জান বক্স খাঁ কোম্পানীর কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে জাতিকে দুর্ভোগ থেকে রেহাই দেন। গোটা বৃটিশ আমলে চাকমারা আর বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা নেয়নি।
59. Aftab Ahmed, ``Ethnicity and Insurgency in the Chittagong Hill Tracts Region: A study of the Crisis of Political Integration in Bangladesh,'' *Journal of the Commonwealth and Comparative Politics*, খণ্ড ৩১, নং ৩, ১৯৯৩
60. Sakya Prasad Talukdar, *The Chakmas : Life and Struggle* (New Delhi, ১৯৮৮, পৃ. ৪৭
61. কামিনী দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৬২. কুমার কোকনদাক্ষ রায়, "বিপুল সুদূর", *গৈরিকা*, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি ভারতের শাসক দলের নীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ নাজমুল হুদা*

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর তৎকালীন ভারতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক ও উষ্ণ ছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি কঠোর অবস্থান নেন। কারণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজন ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনকে সহজভাবে নেননি। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা দল ক্ষমতায় বসে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করে। ফলে ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জনতা পার্টি দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিল। এ নীতির উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো যাতে যৌথভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে পারে। দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে ভারত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এ প্রয়োগ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি সমঝোতামূলক 'গুজরাল মতবাদ' ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাথে পানি চুক্তির ব্যাপারে ভারতের ছাড় ও সমঝোতামূলক মনোভাবে গুজরাল মতবাদের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজেপি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদের ওপর জোর দেয়। ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোও মাঝে মাঝে কমবেশী অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুকে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কর্তৃত্ববাদী নীতি সব সময় বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে হতাশ ও ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করেছে। বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব এ প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে ও পররাষ্ট্রনীতি গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্ধারক কাজ করে। বিশেষ করে পরিবর্তন প্রবণ গতিশীল আন্তর্জাতিক পরিবেশ এ-ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখে। সাধারণত অর্থনৈতিক লাভ ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট কর্তৃত্বশীল নির্ধারক হিসেবে যে-কোনো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে পরিচালনা করে। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরের

* সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, সিটি ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা।

জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার ধারণা সম্পর্কের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ভৌগোলিকভাবে নিকটবর্তী বৃহৎ শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পশক্তিসম্পন্ন দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক অনেক সময় উদ্বেগ ও শঙ্কার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা ও অর্থনৈতিক লাভকে সম্পর্ক বজায় রাখার ভিত্তি হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়। তবে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১] বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর প্রতি ভারতের মনোভাব আধিপত্যমূলক প্রবণতা থেকে উদ্ভূত, যা ভারতের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের পর ভারত ক্ষমতার আবরণে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে তাদের নিজস্ব কাজ বলে মনে করতে থাকে। এ অঞ্চলের ছোট দেশগুলো যাতে বাইরের অঞ্চলের কোনো দেশের সাথে নিরাপত্তা সংযোগ স্থাপন না করে তার জন্য ভারত চাপ দেয়। এমনকি উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ নিজেদের একে অপরের নিরাপত্তা উদ্বেগ দূর করার জন্য পারস্পরিক সাহায্য ও সহায়তাকে ভারত সহ্য করে না।[২] এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক রচনার প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য ভারতের ক্ষমতাসীন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল যেমন- কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) উদ্ভব, গঠন ও পররাষ্ট্রনীতি তথা বাংলাদেশ সম্পর্কে দলীয় অবস্থানের পরিচয় তুলে ধরা। এ ছাড়া ইন্ডিয়া ডকট্রিন ও গুজরাল ডকট্রিন সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করা।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নির্ধারক প্রসঙ্গে দিল্লীর নিরাপত্তাবিষয়ক বিশ্লেষক সুভাষ কাপিলা বলেন যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক অথবা রাজনৈতিক অথবা কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রয়কের ওপর নির্ভরশীল নয়। দু'দেশের সম্পর্কে একমাত্র নিয়ন্ত্রক ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর বিষয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান তিনটি বিষয় হলো- ১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অস্থিরতা সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান আর চীনের সম্পর্কের দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এককভাবে অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে অথবা চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এ অঞ্চলকে উত্তপ্ত রেখে ভারতকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে। ২. ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশকে ভারত কখনোই তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা বাড়ানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারেনা। ৩. ভারতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিতে পারেনা। ইসলামী জঙ্গিবাদী বাংলাদেশ শুধু ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী।[৩] তা ছাড়া

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষক এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিবেচনায়ও বাংলাদেশের প্রতি ভারতের নীতি ভারসাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৪] এ ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও দলীয় আদর্শিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন এবং আকৃতি ও রূপ দিয়েছে ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী, বিশেষ করে ক্যারিশম্যাটিক নেতা জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল নেহেরু দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, একটি নৈতিক এবং ন্যায্য বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত অনুঘটকের (catalytic) ভূমিকা পালন করবে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ১৯৪৯ সালের ২৩ মার্চ নতুন দিল্লীতে এশিয়ান সম্পর্ক সম্মেলন (Asian Relations Conference) আহ্বান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে এশিয়ান দেশগুলোর বেশিরভাগ নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনে তিনি বলেন,

> Peace can only come when all countries are free and also when human beings everywhere have freedom and security and opportunities for development. Peace and freedom, therefore, have to be considered both in their political and economic aspects.[৫]

নেহেরুর মতে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণ। তিনি দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতকে বৃটিশ রাজনৈতিক শক্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে মনে করে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যা ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলের শেষের দিকে রাজীব গান্ধীর সময়ে বাস্তব রূপ নেয়। উপমহাদেশে নেহেরুর সাউথ এশিয়ান ভিশন ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থ নিহিত থাকবে প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও আফগানিস্তান, সেন্ট্রাল এশিয়া এবং মায়ানমার, এমনকি দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলো হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। সমতা, একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, একে অপরের ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক হবে বলে বিশ্বাস করতেন। ১৯৪৭ সালের ৪ ডিসেম্বর নেহেরু কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলেন,

> The art of conducting the foreign affairs of a country lies in finding out what is most advantageous to the country. We may talk about peace and freedom and earnestly mean what we say. But in the ultimate analysis, a government functions for the good of the country it governs and no government dare to anything which in the short or long run is manifestly to the disadvantage of the country.[৬]

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পর হতে ভারত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবারের মত কংগ্রেস দলকে পরাজিত করে জনতা কোয়ালিশন দল ক্ষমতায় আসে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করলে ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তাঁর ছেলে রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ভি. পি. সিংয়ের নেতৃত্বে অকংগ্রেসী ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১৩ মাস এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পুনরায় কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। ১৯৯৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এনডিএ) সরকার ক্ষমতায় আসে এবং ২০০৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত শাসন করে । আবার ২০০৪ সালের মে মাসে বাম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এলায়েন্স (ইউপিএ) সরকার ক্ষমতায় আসে ও শাসনকাল পূর্ণ করে এবং ২০০৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস আবার ক্ষমতাসীন হয়েছে, যা আজও ভারতে অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কংগ্রেস দল দ্বারাই বেশিরভাগ সময় শাসিত হয়েছে এবং হচ্ছে। নীচে বাংলাদেশের প্রতি নীতি প্রণয়নে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শ আলোচনা করা হল।

কংগ্রেস

১৮৮৫ সালে কিছু সংখ্যক বিখ্যাত ইংরেজ এবং ভারতের এলিট শ্রেণীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এ ক্ষেত্রে ভারত দরদি সিভিলিয়ান অ্যালেন অকটেভিয়ান হিউম (Allen Octavian Hume) কংগ্রেস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তা কমানো এবং নীতিনির্ধারণসহ প্রশাসনিক বিষয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব ও তাদের মতামত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেস সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।[৭] কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। ভারতের সংবিধান প্রণয়নে কংগ্রেস নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও বেশীর ভাগ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ভারত শাসন করে। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে কংগ্রেস (আই), কংগ্রেস (আর), কংগ্রেস (ও) এবং কংগ্রেস (এস) নামে দলটি কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেস (আই)-কে নির্বাচন কমিশন লোকসভা ও রাজ্যসভাগুলোতে ব্যাপক জয়লাভের কারণে শক্তিধর ক্ষমতাসীন দল হিসেবে অনুমোদন

দেয়। ১৯৮৫ সালে কংগ্রেস (আই) দলটির প্রতিষ্ঠাশতবার্ষিকী উদযাপন করে। শ্রীমান নারায়ণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে,

> that the greatest service that the congress has rendered to India is the maintenance of national unity and solidarity in the face of great dangers and difficulties before and since independence.[৮]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন ভাষা, জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন এলাকার জাতিগত দল উপদল নিয়ে গঠিত এবং সবাইকে দলে রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট দলীয় আদর্শ আছে।[৯] জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস জোট নিরপেক্ষতাকে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরাশক্তিগুলোর ব্লক থেকে দূরে থাকে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের পররাষ্ট্রনীতি গঠনে ব্যক্তিগতভাবে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। তিনি একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সকল বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন। জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নেতা যিনি বিশ্বব্যবস্থার সমস্যাগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব প্রসারিত করেছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ৮ মার্চ কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বিলতে (Constituent Assembly) ভাষণ দেয়ার সময় কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> ... our foreign policy is one of keeping aloof from the big blocks-rivals-and being friendly to all countries and not becoming entangled in any alliances, military or other, that might drag us into any possible conflict.[১০]

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধী, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, এশিয়ান-আফ্রিকান সম্প্রদায়গুলোকে সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সমর্থন দান করা।[১১] কংগ্রেস (আই) দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে এবং এ অঞ্চলে তার নেতৃত্বশীল ভূমিকার স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। এ ছাড়া কংগ্রেস (আই) পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যখন পাকিস্তানের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকে কংগ্রেস স্পষ্টভাবে আশা করে পাকিস্তান উপমহাদেশে ভারতের Preeminent ভূমিকার স্বীকৃতি দেবে। তা ছাড়া কংগ্রেস অন্যান্য পরাশক্তি কর্তৃক পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের সামরিক সহযোগিতা দেয়ার বিরোধিতা করে।[১২]

বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল পর্যন্ত আন্তরিক ও উষ্ণ ছিল। কারণ আওয়ামী লীগের সাথে কংগ্রেসের আদর্শগত মিল আছে। তা ছাড়া মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। কংগ্রেস সবসময় বাংলাদেশকে বন্ধু প্রতিবেশী দেশ মনে করে। তা ছাড়া ভারতের সাথে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নৈকট্য, ভাষাগত মিল ও ঐতিহাসিক সংযোগ বিদ্যমান। বিজেপি সবসময় অবৈধ মাইগ্রেশন সম্পর্কে অভিযোগ করে, কিন্তু কংগ্রেস করে না। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে।[১৩] কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর দু' দেশের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেননি এবং বাংলাদেশের প্রতি কঠোর অবস্থান নেন। তা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে, কারণ চীন তখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব ঘটে।

বাংলাদেশের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজন ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ভারত সহজভাবে নেয়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক হারুন-অর-রশীদ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের কঠোর মনোভাবের কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১. ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সামরিক সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস সামরিক সরকার দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই মিসেস গান্ধী সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলো সমাধান করে সামরিক সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে চাননি। ২. ইন্দিরা গান্ধী অনুভব করলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া মূলত বাংলাদেশের সংবিধানের ইসলামীকরণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী জিয়াউর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতাহীন প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টাকে ভারত বিরোধী হিসেবে ধারণা করেন। ৩. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় গৃহীত 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার দাবির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জিয়ার অনীহাকে ইন্দিরা গান্ধী অন্যায় ও বৈষম্যমূলক মনে করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দুদের সম্পত্তি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া উচিত বলে ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এবং ভারতের চির প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে, যা ভারত খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। ৫. ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বাস করেন প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলোর প্রতি নমনীয় ছিলেন এবং তার মন্ত্রীসভায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রতি শুধু সহানুভূতিশীল নয় পাকিস্তানের সমর্থক ও

বাঙালি নিধনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এমন কিছু ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে ইন্দিরা গান্ধী সন্দেহ করেন।[১৪]

শ্রীলংকাতে তামিল-সিংহলী গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ইন্দিরা ডকট্রিনের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাকে ভারত ডকট্রিন, রাজীব ডকট্রিন, দক্ষিণ এশীয় ডকট্রিন এবং এমনকি মনরো ডকট্রিনের দক্ষিণ এশীয় সংস্করণও বলা হয়। সামরিক বিশ্লেষক ভবানী সেনগুপ্ত উক্ত তত্ত্বের প্রণেতা ও তাত্ত্বিক। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ কমে যাওয়ায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার দক্ষিণ এশিয়াতে উক্ত ডকট্রিন বাস্তবায়নে জোরালো পদক্ষেপ নেয়। শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে বিতর্কিত ইন্দো-শ্রীলংকান চুক্তির (চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল– কলম্বো অন্য কোনো দেশকে শ্রীলংকায় ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না) আওতায় সেখানে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন, ১৯৮৮ সালে মালদ্বীপে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা দমনে হস্তক্ষেপ এবং ১৯৮৯ সালে বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তি সংক্রান্ত মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ভারত কর্তৃক স্থলবেষ্টিত দুর্বল রাষ্ট্র নেপালের ওপর অবরোধ আরোপ ইন্ডিয়া ডকট্রিনের বাস্তব প্রয়োগ ও জ্বলন্ত উদাহরণ।

দক্ষিণ এশিয়াতে দুটি নির্ধারক ভারতকে 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন' প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। সেগুলো হল- ১. ভারতকেন্দ্রিক দক্ষিণ এশিয়া ব্যবস্থা; ২. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ভারতের জন্য সুবিধাজনক দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে ও ভারতের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল নিয়ন্ত্রণকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করা।[১৫] ইন্ডিয়া ডকট্রিনের মূল কথা হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা হবে ভারতকেন্দ্রিক এবং এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা দেয়া প্রধানত ভারতের দায়িত্ব। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রভাব বলয় হিসেবে বিবেচিত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর ভারতের সম্মতি ছাড়া এ অঞ্চলের বাইরে কোনো দেশের সামরিক সাহায্য চাওয়া সমীচীন হবে না। ভারতের এ ধরনের আচরণে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে ভারতের তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আপোষবিরোধী মনোভাবেও ইন্ডিয়া ডকট্রিনের প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনতা পার্টি

বর্তমান জনতা পার্টি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ভারতের কোয়ালিশন সরকারের অংশ বিশেষ ছিল। সেই সময় জনতা পার্টি জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং কংগ্রেস (ও)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে জগজীবন রামের গণতন্ত্রের

জন্য কংগ্রেস এ গ্রুপে যোগ দেয়। যদিও প্রত্যেক গ্রুপ তাদের আলাদা পরিচিতি নতুন দলের সাথে মিশিয়ে দেয়। তবুও জনতা পার্টির পুরো শাসনকাল অভ্যন্তরীণ বিরোধে পরিপূর্ণ ছিল। জনতা সরকারের পতনের পর লোকদল আলাদাভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং বিজেপি নতুন দল হিসেবে গঠিত হয়। কিছু প্রভাবশালী নেতা নিজস্ব ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল গঠন করেন এবং অন্যান্য দলে যোগদান করেন। ফলে অবশিষ্টাংশ নিয়েই গঠিত হয় আজকের জনতা পার্টি। জনতা পার্টির মোরারজী দেশাই ও চন্দ্রশেখর ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে জনতা পার্টি কম ভূমিকা রাখলেও রাজ্য সভায় বিশেষ করে কর্নাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জনতা পার্টি গোড়া গান্ধিবাদী সোস্যালিষ্ট (Orthodox Gandhian Socialists) আদর্শ অনুসরণ করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ এ আদর্শের একজন অনুসারী।[১৬] ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা দল ক্ষমতায় বসে। মোরারজী দেশাই ক্ষমতা গ্রহণের পর ঘোষণা করেন, তাঁর সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করতে আগ্রহী এবং প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অন্যায় কাজ বন্ধের আশা ব্যক্ত করেন।

জনতা পার্টির কোয়ালিশন সরকারে সোস্যালিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য তিনটি দল পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপন্থী ও আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে ডানপন্থী নীতি অবলম্বন করেছিল। সোস্যালিষ্ট পার্টি সামাজিক সমতাবাদ স্বীকার করত, কিন্তু জনতাদলের অন্যান্য শরীকদের সাথে পাশ্চাত্যপন্থী (Pro-western) পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত ছিল।[১৭] জনতা দলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

> It has been the purpose of India's foreign policy to promote harmony, trust and a co-operative spirit among nations. Such a relationship among nations would strengthen peace, eliminate tensions and reduce the danger of conflict. The main object of our foreign policy is to create around us an environment of peace, trust and stability which would permit optimum utilization of our natural and man power resources for economic, social and cultural advancement. It is only in a climate of trust and peace that the creative forces of our people can be released and harnessed for improving the well being of society.[১৮]

জনতা পার্টির সরকার নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য "লাভজনক দ্বিপাক্ষিকতা নীতির" (Beneficial Bilateralism) সূচনা করে। এ নীতি গ্রহণ করার পূর্বে জনতা সরকার পূর্ববর্তী সরকারের প্রতিবেশীদের প্রতি নীতির ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক নীতির প্রমাণ পায়। তাই জনতা সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার এবং আস্থা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের

উদ্দেশ্যে এ নীতির সূচনা করে। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত "Continuity and Change in India's Foreign Policy" শীর্ষক সেমিনারে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দ্বিপাক্ষিকতা নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> The Janata Government, from the first day of its existence, set out deliberately to clear the cobwebs of suspicion, remove misunderstanding and banish the fear of interference. We have not only professed strict non-interference in the internal affairs of our neighbours, but also practiced it, often in the face of great temptation to do the contrary.
>
> In seeking co-operation from and offering it to our neighbours, we have never imposed ourselves upon them. We have gently tried to explain to them the mutuality of advantage in bilateralism and allowed the irresistible logic of geography to assert itself ... . We have conducted and are conducting an open policy of friendship, mutually advantageous co-operation and equal and "beneficial bilateralism" with our neighbours. There are no hidden undertones or traps here… .[১৯]

এ নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরান থেকে ইন্দো-চীন পর্যন্ত আঞ্চলিক সহযোগিতার এলাকা বিস্তার করে ভারতের জাতীয় স্বার্থ হাসিল করা। এ ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অভিন্ন সমস্যা– দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করবে এবং ভারতীয় উপমহাদেশ দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে। দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর শক্তিশালী গ্রুপগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি ভারতের "লাভজনক দ্বিপাক্ষিকতানীতি" বাস্তবায়নে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দেন — ১. ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal rapport), ২. অর্থনৈতিক সমঝোতা (Economic accommodation) এবং ৩. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা (Political neutrality and non-interference in internal affairs)।[২০]

১. ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিবেশী দেশগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলো বার বার সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নেপাল, ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীলংকা এবং ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। তা ছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাজপেয়ী ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে নেপাল, ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ভূটান এবং ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান সফর করেন। অপরদিকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সফর করেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সরকার প্রধান ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ভারত সফর করেন।

২. ভারতের লাভজনক দ্বিপাক্ষিকতানীতির অর্থনৈতিক সুবিধার সুস্পষ্ট প্রমাণ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর সম্পাদিত পানিচুক্তি, নেপাল ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৮ সালের ১৭ মার্চ ব্যবসা ও ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদন এবং ১৯৭৮ সালের ১৪ এপ্রিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সালাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট ডিজাইন ও নির্মাণ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ফারাক্কা চুক্তির মাধ্যমে ভারত পশ্চিমবঙ্গ ও বিশেষ করে বাণিজ্যিক বন্দর কলকাতার স্বার্থ ক্ষতি করে বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী পানির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

৩. ভারত "লাভজনক দ্বিপাক্ষিকতানীতি" বাস্তবায়নে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কঠোরভাবে "নিরপেক্ষতা ও হস্তক্ষেপ বিরোধী" কৌশল অবলম্বন করে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে লন্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন চলাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর ভারত বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয় এবং রাজনৈতিকভাবে নির্বাসিত ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাজপেয়ী আরও বলেন, "The Janata Government would not allow Indian territory to be used for "hostile activities" against our partner nations." ভারত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরোধী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করে তা প্রমাণ করে। এ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা ফণিভূষণ মজুমদার বলেন,

> Some of our workers had sought refuge in India (after the 1975 crackdown). But since the new government came to power in New Delhi, these workers have been sent back, often at gun point, only to be jailed or tortured by the military rulers.[২১]

এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা কাদের সিদ্দিকীকেও অপমানিত করে বাংলাদেশে ফিরে আসতে জনতা সরকার বাধ্য করে। প্রকৃতপক্ষে ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কৌশলগত বিষয়ে কোনো সমঝোতা করেনি।

ইন্ডিয়া ডকট্রিনের মূল বৈশিষ্ট্য হল দক্ষিণ এশিয়াকে অতি আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। দ্বিপাক্ষিকতানীতি এটি সম্পাদন করতে সাহায্য করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক অশোক কাপুরের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে:

> Bilateralism is the opposite of internationalism as well as of regionalism. Bilateralism is a negation of the super power doctrine that the super powers have a right to be involved in regional disputes because they know no frontiers and have worldwide interests. Bilateralism, therefore, is an approach that seeks to reduce and, whenever possible, to eliminate the harmful influences of superpowers in regional affairs. In this way, bilateralism is meant to choke foreign interference by cutting off the external supply of oxygen in the form of foreign support for the locally dissatisfied state.[২২]

ভারতের দ্বিপাক্ষিকতা নীতি অবলম্বনের অন্য একটি উদ্দেশ্য হল, যাতে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌথভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে পারে। এ নীতি ভারত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সফলভাবে প্রয়োগ করেছিল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ককেও অন্তর্ভুক্ত করেন।[২৩]

১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ও ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করে। কলম্বো সম্মেলনে বাংলাদেশ কোন সমর্থন না পাওয়ায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১তম অধিবেশনে ইস্যুটি তুলে ধরে। সেনেগাল, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলংকার অনুরোধে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি ফারাক্কা ইস্যুটি স্থগিত করে এবং বিবদমান দেশগুলোকে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধানের আহবান জানায়।[২৪] বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানে কোনো প্রকার আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক কর্মকৌশলের ব্যাপারে ভারতের তীব্র অনীহা। বাংলাদেশ ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে ধ্বংসকারী বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল। নদীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণেই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। ফলে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের যে-কোনো দেশের তুলনায় অধিকতর বন্যাপ্রবণ। এ দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধান ও সাধারণ মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারত, চীন, নেপালকে সংযুক্ত করে আঞ্চলিকভাবে সমাধানের প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বন্যা পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নেয়া হয়। বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের খসড়া প্রস্তাবে ভারত আঞ্চলিক সমাধানে কোনো ধারা সংযোজন সফলভাবে প্রতিরোধ করে। ঢাকা প্রস্তাবে বাংলাদেশের বন্যা-সমস্যা সমাধানে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। ভারত বন্যা-সমস্যা সমাধানে বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজনের বিরোধিতা করে এবং যৌথ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামে নেপাল ও চীনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা বিবেচনার অযোগ্য বলে ঘোষণা করে।

তা ছাড়া ভারত বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণে যদি কোনো আঞ্চলিক পদ্ধতির উল্লেখ থাকে তাহলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের ওপর ভোট নেয়ার হুমকি দেয়। ভারতের তীব্র বিরোধিতার মুখে জাতিসংঘ সমস্যা সমাধানে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দেয় এবং সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে সকল সদস্য দেশকে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামে সহায়তা করার আহ্বান জানায়। কিন্তু প্রস্তাবে সমস্যা সমাধানে কোনো সুনির্দিষ্ট বহুপাক্ষিক কৌশলের উল্লেখ ছিল না। ভারত ১৯৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিকতানীতি সার্ক সনদের অন্তর্ভুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিকতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করায় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ ইস্যুতে বহুপাক্ষিক কৌশলকে ভারত বিবেচনার অযোগ্য মনে করে। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতির কারণে সমাধানের জন্য দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তবে এটা সম্ভব নয় এ কারণে যে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো ভারতের সাথে তাদের সমস্যা সমাধানে এককভাবে অবস্থান নিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে দরকষাকষির সুবিধাটা ভারতের হাতেই থাকে।[২৫] পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের শাসনামলে (১৯৮০-১৯৮৯) দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক জনতা পার্টির শাসনকালের চেয়ে ভাল ছিল না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।[২৬]

১৯৯৬ সালের জুন মাসে ভারতে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের প্রতি অধিক সমঝোতামূলক মনোভাব প্রকাশ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'গুজরাল মতবাদ' (Gujral Doctrine) ঘোষণা করেন। ইন্দর কুমার গুজরাল মিষ্টভাষী, অমায়িক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি ভারতের দু'বার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং একবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর নিকট সদাচারী হিসেবেও সুপরিচিত। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পররাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনার জন্য গুজরাল পাঁচটি নীতি প্রবর্তন করেন। এগুলোকে একত্রে গুজরাল তত্ত্ব (Gujral Doctrine) বলা হয়। গুজরাল ডকট্রিন হল: ১. বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকার মত প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ভারত পারস্পরিক আদান-প্রদানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরল বিশ্বাসে সাধ্যমত প্রদান ও আপোসরফা করবে। ২. দক্ষিণ এশিয়ার কোন রাষ্ট্র এ অঞ্চলের অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজের ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেবেনা। ৩. এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। ৪. দক্ষিণ এশিয়ার সকল রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শন করবে। ৫. প্রত্যেকে শান্তিপূর্ণ এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসা করবে।[২৭]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের অসম নীতি (asymmetrical policy), তার প্রতিবেশীরা যা করবে তার চেয়ে বেশী করার নীতি এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলো গুজরাল তত্ত্বের মূল সারমর্ম। এর মধ্যে নেই পারস্পরিক আদান-প্রদানের (Reciprocity) কোন বিষয়, নেই কোন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা (Check and Balance), এমনকি নেই বহুপক্ষীয় আলোচনার (Multilateral Deliberations) উদার কোন ক্ষেত্র।[২৮] গুজরাল মতবাদে ভারতের কৌশলগত দর্শনে নতুন ধরনের আপেক্ষিক

নমনীয়তা সত্ত্বেও এতে নয়াদিল্লীর অতীত আধিপত্য ও কর্তৃত্বসুলভ মনোভাবের ধারা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য একে ভারতের পক্ষ থেকে 'সৎ প্রতিবেশীসুলভ' মতবাদ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানকে গুজরাল মতবাদের ইতিবাচক ধারার বাইরে রেখে ভারত মূলত প্রতিবেশী দেশগুলোকে 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে ভাগ করার প্রয়াসী হয়। এটা মনে হয় উদ্দেশ্যমূলক যাতে প্রতিবেশী দেশগুলো পাকিস্তান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং ভারতের খুব কাছাকাছি আসে। তা ছাড়া গুজরাল মতবাদের দ্বিতীয় ধারায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমানার ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যত ভারতের একক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তার মাপকাঠি দ্বারা প্রতিবেশী দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সার্বভৌম অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা। তারপরও ইন্ডিয়া ডকট্রিনের হস্তক্ষেপমূলক ও সম্প্রসারণবাদী ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় গুজরাল মতবাদকে আপেক্ষিকভাবে উদার ও সমঝোতামূলক মনে হয়। কেননা এ মতবাদের মধ্যে ভারত প্রথমবারের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি সুযোগ-সুবিধা প্রদানে প্রতিদান ছাড়া এককভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।[২৯]

বাংলাদেশের সঙ্গে পানি চুক্তির বিষয়ে আপেক্ষিকভাবে ভারতের সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে গুজরাল মতবাদের প্রতিফলন ঘটে। দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা দূর করতে ভারত একই ধরনের সমঝোতামূলক মনোভাব প্রকাশ করে। সাপটা বাস্তবায়নসহ বাণিজ্য উদারনীতিকরণের মাধ্যমে ২০০১ সালের মধ্যে সাপটা প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তা ছাড়া ভারতে আশ্রিত পাবর্ত্য চট্টগ্রামের শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানও সহজ করে দেয়।[৩০] ভারতের যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার পূর্বের অন্যান্য ভারতীয় সরকারের তুলনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি অধিকতর সমঝোতা ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবাপন্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারত সামরিক-কৌশলগত নীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। ফলে ভারতের আঞ্চলিক পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ-সবের মাধ্যমে ভারত তার আঞ্চলিক আধিপত্য ও কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য গোপন করতে চায়।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)

১৯৭৯ সালে জনতা পার্টির কোয়ালিশন সরকারের পতনের পর ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজেপি কোন নতুন দল নয়, এটা ভারতীয় জনসংঘের (বিজেএস) অনুবর্তন (Continuation), যা ১৯৫১ সালে সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় জনসংঘের মূল সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ও হিন্দু মহাসভা

থেকে এসেছিল। ভারতীয় জনসংঘ প্রথমদিকে শহরের ডানপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের দল ছিল। বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে মুসলিম ও খ্রীস্টান বিরোধী ছিল এবং এ দল "ভারতীয় সংস্কৃতির" ওপর জোর দেয় ও হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রচার করে।[৩১] পরবর্তীকালে কৌশলগত কারণে ভারতীয় জনসংঘের নাম পরিবর্তন করে 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি) রাখা হয়। বিজেপি'র অভ্যন্তরীণ কর্মসূচীতে আদর্শিক পরিচিতি ব্যাপকভাবে ভারত ও অন্যান্য দেশে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু তাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিজেপি জোরালো হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচি বাস্তবায়নের আশা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও পররাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম বিশ্বের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং পাকিস্তানের প্রতি আপোসমূলক নীতি গ্রহণ করে। তা ছাড়া বিজেপি কংগ্রেস পার্টি থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদের ওপর বিবেচনাযোগ্য গুরুত্ব দেয় এবং ভারতের তথাকথিত "বড় ভাইসুলভ" অবস্থান ত্যাগ করে। নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি বিজেপি'র পররাষ্ট্রনীতি হল:

> The BJP considers improvement of relations with our immediate neighbours like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Ceylon and India and Bhutan as one of the major achievements of Janata's foreign policy. The BJP will continue to pay special attention to the development of these mutually beneficial with our neighbours.[৩২]

বিজেপি'র বক্তব্য অনুযায়ী-

> বাংলাদেশকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের আশ্রয়প্রশ্রয় না দেয়া, অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ, গ্যাস রপ্তানি, ট্রানজিট প্রদান ও ট্র্যাক-১ এবং ট্র্যাক-২ পর্যায়ে আলাপআলোচনার মাধ্যমে দু' দেশের সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে।[৩৩]

নিরাপত্তার ধারণা

ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সহজ যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা চায়। অপরদিকে বাংলাদেশ ভারতের ভেতর দিয়ে ভূটান ও নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য-সংযোগ চায়। বাস্তবে নেপালের সঙ্গে ১৯৯৭ সালের বাণিজ্য যোগাযোগ ভারতের অসহযোগিতার কারণে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। ভূটান-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কও ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। ভারত সরকার নিরাপত্তার অজুহাতে বাংলাদেশকে এ সুযোগ দিতে আপত্তি করে। তা ছাড়া ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত তাঁর আত্মকথা 'মেমোয়ার অফ আ ফরেন সেক্রেটারি' গ্রন্থে এ ধরনের ট্রানজিটের ফলে 'অবৈধ বাংলাদেশীদের ভারতে গমন এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের আশ্রয়লাভ' সহজ হবে বলে উল্লেখ করেন।[৩৪] দক্ষিণ এশিয়ায়

ভারত যে তার সকল ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর ভীতির কারণ তা সকল নিরাপত্তা বিশারদ জানেন। এ সব ছোট রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের কোন শক্তির নিকট থেকে কোন আক্রমণ বা আগ্রাসনের আশঙ্কা করেনা। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-ভীতি সম্পর্কে শ্রীলংকার নিরাপত্তা বিশারদ শেলটন কোডিকারা বলেন,

> A Perception of threat from India is currently common to all its neighbours and it is one of the dilemmas of South Asian politics that while India perceives its neighbours as being integral to its own security. The neighbours perceive India itself as the entity against which security is necessary.[৩৫]

ভারতীয় নিরাপত্তা বিশারদ কে. সুব্রামানিয়াম তাঁর "Bangladesh and India Security" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> বাংলাদেশের উপস্থিতি ভারতের কৌশলগত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা বড় ধরনের দুর্বল অবস্থানের সৃষ্টি করেছে। যদি আসাম বা তৎসংলগ্ন উপজাতির রাজ্যে বা প্রতিবেশী মায়ানমারের পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তাহলে এ অঞ্চলে ভারতের নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় বাংলাদেশ বড় আশংকার কারণ হয়ে উঠতে পারে।[৩৭]

তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এম. বোহরার বলেন,

> বাংলাদেশের জন্যে ভীতির কোন কারণ নেই। কিন্তু ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ চীনের সাথে যেভাবে নিরাপত্তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং বর্তমানে পাকিস্তানের সাথে তার যে সামরিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে তা মনে রেখে ভারতীয় প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারকদের এ ধারণা জন্মেছে যে, চীন অথবা পাকিস্তানের সাথে যেকোনো বিরোধের সময় বর্তমান শক্তির বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় এক অংশকে আটকে রাখতে পারবে।[৩৮]

শত্রুদেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি নেই, কিন্তু চীন ও পাকিস্তানের আছে। ভারতের জন্য বাংলাদেশ সমস্যা নয়। বাংলাদেশের সাথে চীন ও পাকিস্তানের যোগাযোগ বা সুসম্পর্ক ভারত সমস্যা হিসেবে মনে করে।[] তাই ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি হল বাংলাদেশকে নেপাল ও ভূটানের পর্যায়ে এনে, বাংলাদেশকে ভারতীয় প্রতিরক্ষার 'বিস্তৃত ফ্রন্টিয়ার' (Extended Frontier) হিসেবে ব্যবহার করা। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা পারস্পরিক সন্দেহের মধ্যে আবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক লিও রোজ (Leo Rose) উল্লেখ করেন:

> Pakistan has invariably exhibited extreme apprehension over its perception of Indian objectives in the region; India in turn has been critical of Pakistani relationships with extra regional powers which propped up its military capability. Nepal and Srilanka are also concerned with the possibility of Indian encroachment on their sovereignty, a sentiment shared by Bangladesh since 1975.[৩৯]

তিনবিঘা ইস্যু

ভারতীয় জনতা পার্টি ভারত সরকারের বাংলাদেশের নিকট তিনবিঘা হস্তান্তরের তীব্র সমালোচনা করে এবং ভারতের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটা ছাড়াও সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক ব্যবসা বাড়বে বলে অভিযোগ করেছিল। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন বাংলাদেশের নিকট তিনবিঘা হস্তান্তর অনুষ্ঠানের দিন পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মীরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল।[৪০] ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মীদের শ্লোগান ছিল "তিনবিঘা দিচ্ছি না, দেবো না", "রক্ত দেবো, তিনবিঘা দেবো না", "সুপ্রীম কোর্টের রায় মানি না, মানবো না", "দহগ্রাম হবে ভিয়েতনাম".... ইত্যাদি।[৪১] তা ছাড়া ফরোয়ার্ড ব্লকের একটা অংশ ও জনতা পার্টি বাংলাদেশের নিকট তিনবিঘা ফেরতদানের বিরোধিতা করে।[৪২] অবশ্য জনতা দলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই, কে, গুজরাল ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু আনুষ্ঠানিকভাবে তিনবিঘা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তবে তিনবিঘা ইস্যুতে কংগ্রেস বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছিল।[৪৩]

পানি চুক্তি ইস্যু

১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারতের জনতা পার্টির সাথে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত পানি চুক্তি সম্পর্কে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় আদর্শ নির্বিশেষে চুক্তির কঠোর সমালোচনা করে এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়নি বলে মন্তব্য করে। তা ছাড়া ভারতের পত্রপত্রিকা, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[৪৪] ১৯৭৭ সালের ফারাক্কা চুক্তি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী ও গবেষক জয়ন্ত কুমার রায় সমালোচনা করে বলেন,

> After all, the aim of the Farakka project was to save the Calcutta port at an expense of Rs 1,560 million, not to create cordial relations with Bangladesh. There can be other ways of achieving friendly relations with Bangladesh without defeating the aim of the Farakka project.[৪৫]

কংগ্রেস দলের এমপি সৌগত রায় এ চুক্তিতে বাংলাদেশকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দেয়া হয়েছে এবং কলকাতা বন্দরের স্বার্থের ক্ষতি হয়েছে বলে সমালোচনা করেন। এ ছাড়া তিনি বলেন,

> ... it will serve the interests of military Junta, the political interests; they are torturing the people of Bangladesh. This is what the agreement amounts to.[৪৬]

১৯৯৬ সালে ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত পানি চুক্তির প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর '৯৬ বিজেপি'র পশ্চিমবঙ্গ শাখা গঙ্গায় নৌকায় চড়ে চুক্তির বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ করেছিল। ১৬ ডিসেম্বর '৯৬ পশ্চিমবঙ্গের হাবড়ায় বিজেপি আয়োজিত জনসভায় বিজেপি'র সভাপতি

লালকৃষ্ণ আদভানী বলেছিলেন, এটা একটি কালো চুক্তি। এতে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে। এ জন্যে স্থানীয় বিজেপি'র যে-কোনো আন্দোলনে কেন্দ্রের সমর্থন থাকার উল্লেখ করেছিলেন। তা ছাড়া কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন মিত্র গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। কলকাতা বন্দরের সাবেক চেয়ারম্যান অনিমেষ চন্দ্র রায় মন্তব্য করেন, এ চুক্তির ফলে কলকাতা বন্দরে বিদেশী জাহাজ আসার সম্ভাবনা কমে গেল।[৪৭] পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু পানি চুক্তি স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটি তাঁর সদিচ্ছার প্রমাণ এবং দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে রাজি হয়ে তিনি স্পষ্টত বাংলাদেশকে একটি বড়ো রকমের ছাড় দিয়েছিলেন। কারণ, গঙ্গা নদীর পানি নিয়ে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সাথে পশ্চিমবঙ্গের একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে।[৪৮] মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকারের সাথে বাংলাদেশের জিয়া সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা মিল ছিল বলেই ১৯৭৭ সালে পানি চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল। আবার ভারতের কংগ্রেস সরকারের সাথে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন এরশাদ ও খালেদা জিয়া সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের কারণে কোনো চুক্তি হতে পারেনি। আবার ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে তৎকালীন ভারতের কোয়ালিশন সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মিল ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করে। উল্লেখ্য যে, ভারতের কোয়ালিশন সরকারে কংগ্রেসসহ অন্যান্য দলের সমর্থন ছিল।

অবৈধ অনুপ্রবেশ

ভারত বাংলাদেশী নাগরিকদের অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার অভিযোগ করে, যা ভারত- বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে তিক্ততার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ ভারতের অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ কখনও স্বীকার করেনি। ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রমাণ করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অনুপ্রবেশের বিষয়ে ভারতের সাথে কোনো বিরোধ ছিল না। পরবর্তীকালে ভারত তার নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এ সমস্যাকে দেখতে থাকে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি'র শাসনামলে ভারত পুশব্যাকের নামে বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দিলে এ ইস্যুতে দু' দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ভারত জোরপূর্বক পুশব্যাকের কার্যক্রম বন্ধ রাখে এবং ২০০১ সালে পুনরায় বিএনপি ক্ষমতাসীন হলে ভারত আবার অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ তোলে। ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২ মিলিয়ন অবৈধ বাংলাদেশী ভারতে বাস করে বলে উল্লেখ করেন।[৪৯] ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার অনুভব করে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে

তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সমস্যাটি আলোচনা হয়। এ বিষয়টি একচল্লিশ জন সদস্য রাজ্যসভায় উপস্থাপন করেন। ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে। জাতিগত ও ভাষাগত অভিন্নতার কারণে দু' দেশের জনগণের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করা খুবই কঠিন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য হাজার হাজার বাংলাদেশী ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করছে বলে ভারতর অভিযোগ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বাংলাদেশ সফরের সময় অবৈধ অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করেন। উভয় দেশ একমত হয় সীমান্তে অবৈধভাবে চলাফেরা বন্ধ করার জন্য যাতে দু' দেশের সম্পর্ক তিক্ত না হয়। তৎকালীন ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবুল এহসানের নিকট ভারতের পররাষ্ট্র সচিব আর. ডি. সাতে ১৯৮০ সালের মে মাসে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ব্যাপকভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়,আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে ভারত সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং যা ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য ভারত সরকার সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, অতিরিক্ত সীমান্তরক্ষী মোতায়েন, সীমান্তে টহল ব্যবস্থা জোরদার ও বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য চাওয়া হয়।[৫০]

বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনবরত অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ বাংলাদেশ অস্বীকার করে। বাংলাদেশ মনে করে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন এবং এ ইস্যুতে ভারতের সাথে সমঝোতার প্রয়োজন নেই। বরং ভারত আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ হতে বিদেশী নাগরিক মনে করে বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়। ভারতের যুক্তি হল বাংলাদেশের জনগণের চরম দারিদ্র্য ও ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার কারণে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে।[৫১] বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিশেষ করে আসামের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে এবং নির্বাচনী ইস্যুতে প্রাধান্য পায়। কিন্তু বিজেপি'র শাসনকালে দু' দেশের মধ্যে পানি সম্পদ, ব্যবসা ও প্রতিরক্ষা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা হলেও অবৈধ অনুপ্রবেশের ইস্যুটি আলোচনার বাইরে রাখে।[৫২] ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিজেপি'র জাতীয় পরিষদ বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী নাগরিক ভারতে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির পরিবর্তন করছে বলে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পাশ করেছিল। বিজেপি'র মতামত হল অবৈধ অনুপ্রবেশ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের আলোকিত জনমত জাতিকে বিপন্নকারী এ মারাত্মক ইস্যুতে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। বিজেপি এ সুযোগে নীরব জনসংখ্যা আক্রমণের

রাজনৈতিক বিপদ সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে দেয়। বিজেপি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের রাজনৈতিক দলের সুবিধা সম্পর্কে সবসময় উল্লেখ করে আসছে। এ অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভোট ১৯৮৭ সালে শতকরা ০.৫ হতে ১৯৯১ সালে শতকরা ১১.৪ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৮৪ সালে শতকরা ৭.৪ হতে ১৯৯১ সালে শতকরা ২১.৯ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫৩] অনুপ্রবেশ সম্পর্কে এন এন ঝা বলেন, সীমান্তে বেড়া নির্মাণ হলে সীমান্তে হাঙ্গামা, হত্যা ও অবৈধ অনুপ্রবেশ কমবে।[৫৪] ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে বিজেপি ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেছে। তা ছাড়া বিজেপি'র ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে সন্ত্রাসবাদ– সমস্যার জন্ম দিচ্ছে বলে নিয়মিত প্রচার করছে এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক এলায়েন্স কোয়ালিশন সরকারের শাসনকালে সমস্যা সমাধানে কোন কার্যকর নীতি গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও অবৈধ অনুপ্রবেশকে সমস্যা হিসেবে মনে করেছে, তবে বিজেপি'র মত কঠোর ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা হিসেবে গণ্য করে না।[৫৫] অথচ বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কোনো কাজ করেনি।[৫৬] প্রকৃতপক্ষে বিজেপি অবৈধ অনুপ্রবেশের ইস্যুটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে।

ভারতের সাবেক কূটনীতিকরা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর প্রতি ভারতের বড় ভাইসুলভ আচরণ, দ্বন্দ্ব ও অবহেলাপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে দোষারোপ করেন। এ সম্পর্কে ভারতের একজন সাবেক কূটনীতিক বলেন,

> India's policy towards neighbours suffered from a sense of 'Superiority' and 'Neglect'. Prime Ministers and foreign ministers often feel shy in visiting neighbouring capitals and senior diplomats falter on the count of being polite and courteous towards their neighbouring counterparts. There is a lingering shadow of the British imperial mindset of the Indian bureaucracy when it comes to dealing with neighbouring countries and their citizens.[৫৭]

কোনো প্রতিবেশী দেশের সাথেই ভারতের সুসম্পর্ক নেই। ফলে সমস্যাপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কারণে আঞ্চলিক পরিবেশও অনাকাঙ্ক্ষিত। জওহরলাল নেহেরু বিশ্বদ্যিালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক অনিরুদ্ধ গুপ্ত তাঁর 'A Brahmanic Framework of Power in South Asia' প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির সমালোচনা করে বলেন, "The Indian mindset of treating its neighbours as

inferior."[৫৮] প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের নীতি সবসময় Low Profile অনুসরণ করে, যদিও একেবারে উপেক্ষা করে না। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষকের বক্তব্য:

> The Bangladesh-India relations are further complicated by the fact that while their exists an Indian factor for Bangladesh, there exists no such corresponding Bangladesh factor for India. India's inertia, lack of political will and sympathy to settle the outstanding contentious issues is indicative of this. For New Delhi, these are irritants, but for Dhaka, these are vital issues. Delhi's attitude only sharpens Bangladesh's hostility towards India and militates against pulling the relationship too close.[৫৯]

তা ছাড়া বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি ভারতের আমলাতন্ত্র চরমভাবে কর্তৃত্বশীল মনোভাব প্রদর্শন করে।[৬০] বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ সম্পর্কে ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব A. P. Venkateswaran মন্তব্য করেন:

> We have three basic interests vis-à-vis Bangladesh. The important is to retain a legitimate proportion of the lean-season flows of the Ganga and other rivers that we share with that country. Secondly, we have an interest in the welfare of the minorities in Bangladesh, since any marked deterioration in their living conditions provokes immigration to India and adds to an already festering problem. Thirdly, the illegal migration that had already taken place has caused enormous socio-economic problems in our bordering states. It is in our vital interest to see that this process stops and is reversed, with the return to Bangladesh of those who have illegally entered our country.[৬১]

উপসংহার

স্বাধীনতার পর তৎকালীন ভারতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক ও উষ্ণ ছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। কারণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজন ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনকে সহজভাবে নেননি। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা দল ক্ষমতায় বসে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করে। ফলে ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেস পানি চুক্তিতে ভারতের জাতীয় স্বার্থের চরম ক্ষতি হয়েছে বলে সমালোচনা করেছিল। জনতা পার্টি দ্বিপাক্ষিকতা

নীতিকে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিল। এ নীতির উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো যাতে যৌথভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে পারে। দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে ভারত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এ প্রয়োগ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি সমঝোতামূলক 'গুজরাল মতবাদ' ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাথে পানি চুক্তির ব্যাপারে ভারতের ছাড় ও সমঝোতামূলক মনোভাবে গুজরাল মতবাদের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজেপি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদের ওপর জোর দেয়। তবে বিজেপি বাংলাদেশের অভিবাসী ইস্যুকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেছে। যদিও বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালীন অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোও মাঝে মাঝে কমবেশী অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুকে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কর্তৃত্ববাদী নীতি সব সময় বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে হতাশ ও ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করেছে।

নীতিকে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিল। এ নীতির উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো যাতে যৌথভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে পারে। দ্বিপাক্ষিকতা নীতিকে ভারত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এ প্রয়োগ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি সমঝোতামূলক 'গুজরাল মতবাদ' ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাথে পানি চুক্তির ব্যাপারে ভারতের ছাড় ও সমঝোতামূলক মনোভাবে গুজরাল মতবাদের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজেপি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদের ওপর জোর দেয়। তবে বিজেপি বাংলাদেশের অভিবাসী ইস্যুকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেছে। যদিও বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালীন অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোও মাঝে মাঝে কমবেশী অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুকে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কর্তৃত্ববাদী নীতি সব সময় বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে হতাশ ও ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Brigadier General M. Sakhawat Hussain, *Regional Conflicts Impact on Global Peace,* Dhaka: Palok Publishers and Bangladesh Research Forum, February 2008, পৃ. ৬৭

২. S. A. Zafar, Indo-Bangladesh Relations: Problems and Prospects, *Pakistan Horison*, Vol. 46, No. 3&4, July-October 1993, পৃ. ৯০

৩. দৈনিক প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৫, উদ্ধৃত, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব:), *দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা,* ঢাকা, পালক পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৪১-৩৪২

৪. Brigadier General M. Sakhawat Hussain, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৫. J. N. Dixit, *Makers of India's Foreign Policy Raja Ram Mohun Roy to Yashwant Sinha,* New Delhi HarperColklins Publishers, 2004. পৃ. ৮৪

৬. A. Appadorai and M. S. Rajan, *India'a Foreign Policy and Relations,* New Delhi South Asian Publishers Private Ltd., March 1985, পৃ. ৩২

৭. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম. মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩৯৫

৮. P. Sharan, "Congress and The Making of Modern India," in N. S. Gehlot (ed.), *The Congress Party in India Policies. Culture. Performance*, New Delhi: Deep and Deep Publications, 1991, পৃ. ১-২

৯. P. John, The Indian National Congress Needs An Ideology, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
১০. http: //pavanblog.com/2009/04/08/the-evolution-of-indias-foreign-policy/accessed on 14 October 2011
১১. P. Sharan, "Congress and The Making of Modern India," প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
১২. George E. Delury (ed.), *World Encyclopedia of Political Systems and Parties,* Vol. 1, Afghanistan-Luxembourg, New York: Facts and File Publications, 1987, পৃ. ৪৯২
১৩. সাক্ষাৎকার, রাভনি ঠাকুর, যুগ্ম সম্পাদক, পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ, জাতীয় কংগ্রেস এবং অধ্যাপক, ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী, ২৫ মার্চ ২০১০
১৪. Harun ur Rashid, *Indo-Bangladesh Relations: An Insider's View,* New Delhi: Har-Anand Publications PVT LTD, 2002, পৃ. ৬০-৬১
১৫. Ishtiaq Hossain, India's Policy in South Asia, *Regional Studies,* Vol. 8, No. 3, Summer 1990, পৃ. ৮৭
১৬. George E. Delury (ed.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬
১৭. Naveed Ahmad, Recent Developments in Indian Foreign Policy, *Pakistan Horizon,* Vol. xxxiii, No.3, 1980, পৃ. ৪৯
১৮. Atal Behari Vajpayee, India's Foreign Policy Today, in Bimal Prasad (ed.), *India's Foreign Policy Studies in Continuity and Change,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1979, পৃ. ৩
১৯. S. D. Muni, India's 'Beneficial Bilateralism' in South Asia, *India Quarterly,* Vol. 35, No. 4, Oct-December 1979, পৃ. ৪১৭-৪১৮
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮-৪১৯
২২. Ashok Kapur, The Indian Subcontinent The Contemporary Structure of Power and the Development of Power Relations, *Asian Survey*, Vol. XXVIII, No.7, July 1988, পৃ. ৬৯৭
২৩. Ishtiaq Hossain, "India's Policy in South Asia", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
২৪. Ishtiaq Hossain, Bangladesh-India Relations: Issues and Problems, in Emajuddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh A Small State's Imperative,* Dhaka: Komol Kuri Prokason, May 2004, পৃ. ৬২
২৫. Ishtiaq Hossain, *India's Policy in South Asia*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১
২৬. Partha S. Ghosh, Communal Hindu Politics in India: Foreign Policy Implications, *BIISS Journal,* Vol. 15, No.4, 1994, পৃ. ৩০৭
২৭. Padmaja Murthy, The Gujral Doctrine and Beyond, *Strategic Analysis,* Vol. XXIII, No. 4, July 1999, পৃ. ১
২৮. এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি কিছু কথা ও কথকতা,* ঢাকা, মৌলি প্রকাশনী, বইমেলা ১৯৯৯, পৃ. ৫৩
২৯. আবুল কালাম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৭৯

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯
৩১. Shahi Tharoor, *Reasons of State Political Development and India's Foreign Policy Under Indira Gandhi 1966-1977,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1982, পৃ. ১৭
৩২. Partha S. Ghosh, *BJP and the Evolution of Hindu Nationalism From Periphery to Centre,* New Delhi: Manohar, 2000, পৃ. ৩৩৭-৩৮
৩৩. সাক্ষাৎকার: এন এন ঝা, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আহ্বায়ক, পররাষ্ট্র বিষয়ক সেল, বিজেপি, নয়াদিল্লী, ২৬ মার্চ ২০১০
৩৪. আকমল হোসেন, *সাম্প্রতিক দেশ বিদেশের সমাজ ও নীতি,* ঢাকা, গ্রন্থকানন, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৬৪-৬৫
৩৫. এমাজউদ্দীন আহমদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ,* ঢাকা, শিকড়, ২১ বইমেলা ২০০২, পৃ. ২৩৪
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৩৮. সাক্ষাৎকার, পার্থ এস. ঘোষ, অধ্যাপক, স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী, ২৬ মার্চ ২০১০
৩৯. Ishtiaq Hossain, India's Policy in South Asia, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৪০. R C Mishra (IPS), *Security in South Asia,* New Delhi: Authors Press, 2000, পৃ. ৬৭
৪১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পররাষ্ট্রনীতি '৯০ দাতা দেশের চাপ ও বিপন্ন ভাবমূর্তির বছর, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৪ জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৬৭
৪২. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি,* ঢাকা, এম. আবদুল্লাহ এন্ড সন্স, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ. ২০
৪৩. A.K.M. Abdus Sabur, "Some Reflections on the Dynamics of Bangladesh-India Relations," in Iftekharuzzaman and Imtiaz Ahmed (eds.), *Bangladesh and SAARC Issues, Perspectives and Outlook*, Dhaka: Academic Publishers, 1992, পৃ. ১৪৩
৪৪. P. Sukumaran Nair, *Indo-Bangladesh Relations,* New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation, 2008, পৃ. ১৫৮-১৫৯
৪৫. Jayanta Kumar Roy, The Farakka Agreement, *International Studies,* Vol. 17, No. 1, January-March, 1978, পৃ. ২৪৫
৪৬. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৮১),* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৯, পৃ. ১৪৭
৪৭. মনোয়ারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত,* ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ২০৯
৪৮. আকমল হোসেন, *সাম্প্রতিক দেশ বিদেশের সমাজ ও নীতি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৪৯. Akmal Hussain, Bangladesh's New Foreign Policy Direction in Southeast and East Asia: Perspective and Goals, Journal of International Development and Cooperation, Vol. 12, No. 1, 2005, IDEC (Graduate School for International Development), Hiroshima University, Japan, পৃ. ৪

৫০. S. S. Bindra, *Indo-Bangladesh Relations*, New Delhi: Deep and Deep Publications, 1982, পৃ. ৫৬-৫৭

৫১. Chandrika J. Gulati, *Bangladesh: Liberation to Fundamentalism* (A Study of Volatile Indo-Bangladesh Relations), New Delhi: Commonwealth Publishers, 1988, পৃ. ১৪৮-১৫০

৫২. Amera Saeed, Indian Foreign Policy under the BJP, *Regional Studies,* Vol. xxii, No. 2, Spring 2004, পৃ. ১৩

৫৩. Partha S. Ghosh, Communal Hindu Politics in India: Foreign Policy Implications, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১

৫৪. সাক্ষাৎকার, এন এন ঝা, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আহবায়ক, পররাষ্ট্র বিষয়ক সেল, বিজেপি, নয়াদিল্লী, ২৬ মার্চ ২০১০

৫৫. Partha S. Ghosh, Foreign Policy and Indian Politics: Issues Before the 15th General Election, in Ajay K. Mehra (ed.), *Emerging Trends in Indian Politics: The 15th General Election,* New Delhi: Routledge, 2010, পৃ. ৩২৫

৫৬. সাক্ষাৎকারঃ পার্থ এস. ঘোষ, অধ্যাপক, স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী, ২৬ মার্চ ২০১০

৫৭. Kamal Uddin Ahmed, *Bangladesh and Its Neighbours,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, September 2008, পৃ. ৪৬

৫৮. বাংলাবাজার পত্রিকা, ২১ নভেম্বর ১৯৯৫ উদ্ধৃত, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব,* ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৬, পৃ. ৫৭-৫৮

৫৯. Amena Mohsin, "Bangladesh–India Relations: Limitations and Options in an Evolving Relationship" in Emajuddin Ahmed and Abul Kalam (eds.), Bangladesh South Asia and the World, Dhaka: Academic Publishers, 1992, পৃ. ৬৭; Abul Kalam Azad, "Common risks and common solutions for the smaller states of South Asia," in Mohammad Humayun Kabir (ed.), *Small States and Regional Stability in South Asia,* Dhaka: Bangladesh Institute of International and Strategic Studies and The University Press Limited, 2005, পৃ. ১৬৭

৬০. সাক্ষাৎকার: এম. মোর্শেদ খান, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ২৯ এপ্রিল ২০১০

৬১. S. A. Zafar, Indo-Bangladesh Relations: Problems and Prospects, *Pakistan Horizon,* Vol. 46, No. 3&4, July-October 1993, পৃ. ১০০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

কাবিননামায় দাম্পত্যচিত্র

বিলকিস রহমান*

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম পরিবারের ইতিহাস পুনর্গঠনে বড় সমস্যা হচ্ছে উপকরণের সীমাবদ্ধতা। সে-ক্ষেত্রে কাবিননামাকে পারিবারিক ইতিহাস পুনর্গঠনের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

'কাবিননামায় দাম্পত্যচিত্র' প্রবন্ধের প্রধান উৎস কাবিননামা। নারীবাদী গবেষণায় কাবিননামার ব্যবহার বিদ্যমান গবেষণায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে। ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন সম্পর্কে সাধারণের ধারণা, মুসলিম পারিবারিক এই আইনে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অপর দিকে আইনটি শরিয়া বর্হিভূত বলে সমালোচিত হয়েছিল।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ে যে বিধান রয়েছে তা অভূতপূর্ব নয়। বরং উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রাপ্ত ১২৩টি কাবিননামার শর্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর অধিকার রক্ষার কতগুলো ব্যবস্থা এতে রাখা হয়েছে; এমনকি স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার কাবিননামায় সংরক্ষিত ছিল। সমকালীন কাবিননামা থেকে জানা যায় যে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী অধিকার অনেকগুণ বেশি ছিল। পরবর্তীকালে নারীর সে অধিকার নানা কারণে ক্ষুণ্ন হয়েছে। ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন দ্বারা ক্রমাগত অবক্ষয়কে কিছুটা রোধ করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া কাবিননামাগুলো দীর্ঘ সময়ে রচিত এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত। এর শর্তগুলোর মধ্যে যে এক ধরনের সর্বজনীনতা আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

'বিয়ে' মানুষের মৌলিক এবং প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদিমতম রূপ থেকে বর্তমানের কাঠামোয় এসে উপনীত হয়েছে। পরিবর্তনের এই ধারাটি অবশ্য এক এক সময় এক এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিয়ে পরিবার গঠনের প্রধান প্রক্রিয়া। মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবর্তন এবং উত্তরণের ক্ষেত্রে বিয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাডক্লিফ লিখেছেন, Marriage is a social arrangement by which a child is given a legitimate position in the society, determined by parenthood in the social science.[১]

বিয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্ক বলেছেন, 'বিয়ে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কমবেশি স্থায়ী এমন একটি সম্বন্ধ যা বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াকে ছাড়িয়ে সন্তান-উৎপাদনের পরেও বলবৎ থাকে।[২]

---

* wk¶K, Kjv I mvgwRK weÁvb Abl`, Av‡giKvb B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwmwU, XvKv|

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই আকর্ষণের পরিণতিতে ঘটে যৌনমিলন। যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে বিয়ের মাধ্যমে একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

> Marriage has two main functions: it is the means adopted by human society for regulating the relations between the sexes; and it furnishes the mechanism by means of which the relation of child to the community is determined.[৩]

সকল ধর্মেই বিয়েকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়ে সংক্রান্ত সকল নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি লোকজ সংস্কৃতি বৈবাহিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। ইসলাম ধর্মে বৈবাহিক নিয়মাচার, তথা বৈবাহিক জীবনের সকল অধিকার আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইন এবং লোকাচার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সিংহভাগ লোকজীবনে ধর্মীয় অনুশাসনই বৈবাহিক জীবনচক্রের মূল নিয়ন্ত্রক।

অবশ্য বুর্জোয়া ধারণা অনুসারে বিয়ে একটি চুক্তি, একটা বিধান-সংক্রান্ত ব্যাপার এবং এ ধরনের ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সারা জীবনের মতো দুটি দেহ ও মনের একটা মিলন ও সামাজিক চুক্তি সাধিত হয়ে যায়।[৪]

ইসলাম ধর্মে বিয়ে একটি আইনগত, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধান। ইসলামে বিয়ে বলতে দু'পক্ষের একটি চুক্তি বোঝায়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য। বিয়ের চুক্তির মাধ্যমেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে নতুন জীবনের সূচনা লগ্নেই তাদের উভয়ের ওপরে নতুন দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইসলামে বিয়েকে একটি চুক্তিরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য জন্মদান ও সন্তান বৈধকরণ এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। পবিত্র কুরআনে ও হাদিসে বিয়ের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব, দায় ও অধিকার বিধৃত আছে। বিয়েকে মানব প্রজন্মের স্থায়িত্ব ও উন্নতি এবং সমাজ জীবনের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। নর-নারীর এই আইনানুগ ও বৈধ মিলনের মাধ্যমে মানব সূচনা হয়েছে (৪: ১)। আল কুরআনে পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং নারীর জন্য স্বামী আল্লাহ তা'আলার একটি মহা অনুগ্রহ রূপে উল্লিখিত হয়েছে (৩০: ২১)। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন (৩৬: ৩৬)। অর্থাৎ বিবাহ প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পূর্ণ অনুগত এবং স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের উৎকৃষ্টতম মাধ্যম।[৫]

আমাদের দেশে বিবাহের চুক্তিকে সাধারণত নিকাহ্‌নামা বা কাবিননামা বলা হয়। আরবি নিকাহ্ শব্দের অর্থ বলতে আলিঙ্গন বা বন্ধন এবং আইনের ভাষায় সংযুক্ত করা বোঝায়। আমাদের দেশে সাধারণত কাবিননামা বিবাহ চুক্তি বলেই বেশি পরিচিত। কাবিননামা

বিয়ের সত্যতা প্রমাণ করে। মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে নিকাহনামা বা কাবিননামা বিবাহ চুক্তির অত্যাবশ্যক শর্তাবলীর লিখিত দলিল। শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ের যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় তাকেই বলা হয় কাবিননামা।

প্রশ্ন হতে পারে, কাবিননামায় কি করে দাম্পত্যচিত্র থাকতে পারে? যে চুক্তির মাধ্যমে নারীপুরুষ দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করছে, সেই চুক্তি কি শুধু দু'জন পুরুষ সাক্ষী এবং মেয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দু'জন নারী পুরুষের পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে স্বীকার করে নেয়াই কাবিননামা, না-কি এর মধ্যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে? কাবিননামায় স্বামী-স্ত্রীর কি কি অধিকার সংরক্ষিত থাকছে এবং তা পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে কতটুকু পালিত হবে? পারিবারিক ইতিহাস, পারিবারিক সংগঠন এবং পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরিবারের ভেতরে ও বাইরে নর-নারীর সম্পর্কের বিষয়টিও এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কাবিননামার শর্তাবলীর ওপর ভিত্তি করে সমকালীন দাম্পত্য জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা।

গবেষণার ভিত্তি ১৮২৩ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত কাবিননামা। এসব কাবিননামাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাবিননামাটি ১৮২৩ সালের। অন্যদিকে প্রান্তকাল বেছে নেয়া হয়েছে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটির কারণে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীরা কিছু অধিকার লাভ করে, যেমন— তালাক দেবার ক্ষেত্রে, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রশ্নে মতামত দেওয়া প্রভৃতি। এই গবেষণায় প্রাপ্ত কাবিননামাগুলো বিশ্লেষণ করে পুরো উনিশ শতকের এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত ১২৩টি কাবিননামার মধ্যে ১১১টি উনিশ শতকের এবং এগুলো কয়েকটি স্ট্যাম্প পেপারে আরবি, ফারসি ও বাংলায় লিখিত। বিভিন্ন মূল্যমানের স্ট্যাম্পে যেমন, আটআনা স্ট্যাম্পে আবার কুড়ি টাকার স্ট্যাম্পেও তা লিখিত হয়েছে। কতকগুলো কাবিননামায় ফারসি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতেও লেখা আছে এবং তাতে রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর রয়েছে। ১৮৭২ থেকে রেজিস্টার বই-এ কাবিননামা লিখিত রয়েছে। ১৯৩৯-এর প্রাপ্ত কাবিননামা ফরম আকারে মুদ্রিত। এই ফরমটি ১৮৭৬ সালের ১ নং আইন অনুযায়ী লিখিত। কাবিননামা ফরমের পূর্বেরগুলোতে পেশা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ফরমে পেশা উল্লেখের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত নেই। ১২টি কাবিননামা বিশ শতকের। আমার মূল গবেষণা উনিশ শতকের। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ১২টি কাবিননামা এই গবেষণায় প্রতিপাদ্য।

কাবিননামাগুলো ঢাকা, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর, সিলেট, কলকাতা, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ হাজার দুয়ারী প্যালেস থেকে ১টি, ঢাকা যাদুঘর থেকে ৩টি, আলীপুর পুলিশ কোর্ট থেকে সংগ্রহ করা ৮০টি, বাকীগুলো পারিবারিক সংগ্রহ থেকে। ঢাকার পুরনো কাজী অফিসে ১৯৫৭ সালের পূর্বের কোন কাবিননামা পাওয়া যায়নি।

কাবিননামার বিষয় ও লিখনশৈলী অভিন্ন নয়। পরিবারের ধন সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার নিরিখে কাবিনানামার বিষয় ও শর্তাবলির ধারা ভিন্নতর। তবে ১৮৮০ সালে মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দিনের লিখিত *আহকামে সালাত* গ্রন্থে কাবিননামা কিভাবে লিখিত হবে তার ধরন-

> কাবিন।
>
> ইয়াদিজ্বির্দ্দ শ্রীমতি ফলানি বিবি বেন্তে সেখ ফলানা মোতফা স্থানে লিখিতং শ্রী সেখ ফলানা ওরফে ফলানা ওলদে মৃত সেখ ফলানা সাকিন হাল পুরানা মোগলটুলি থানে সদর জিলে ঢাকা কস্য কাবিন নামা পত্র মিদং কায্যঞ্চ গে আমি আপন রাজি রগবতে বহাল তবিয়তে স্বইচ্ছাপূর্বক আপনাকে মং ৫০ টাকা মোহরানা ধার্য করিয়া ফলানা সাকিনের ফলানার পুত্র ফলানার ওকালতিতে ও ফলানার সাকিনের ফলানার দুই সাক্ষীদের সাক্ষতায় হাজেরানে মজলিসের মধ্যে মোসলমানদিগের সরাসরিয়ত মতে চতুর্থ প্রতিজ্ঞা যাহা স্থিরতা আছে তাহা মান্য পূর্বক আপন নিকাহায় কবুল করিলাম। তাহার প্রথম প্রতিজ্ঞা এই যে আপনাকে বেজায় গালি ও কটু বাক্য কি প্রহরাদি দ্বারায় গৃহত্যাগ করাইবো না, দ্বিতীয় শর্ত শহর হইতে বিনা রাজি রগবতে কখনো স্থানান্তর নিব না। এবং খোরপোস হইতে দুঃখ ক্লেশ ও বেতালাফিতে রাখিব না। তৃতীয় আপনার ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব আলয় যাতায়াত করিতে আমি কখনও নিসেদিত ও বাধিত হইব না। চতুর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে অন্যে কোন বিবাহাদি করিব না। আর আমা কর্তৃক আপনার দ্বারায় সরার বরখেলাপ কোন কর্ম উপস্থিত হয় তবে উভয় মধ্যে যাহা দ্বারা হইবেক বিবাহের খরচ সম্পন্ন তাহা হইতে আদায় হইয়া উভয় পুং লাং সরহিত ও কেহর প্রতি কেহর কোন দাবি দায়া থাকিবেক না। আর আপনার মোহরানার মধ্যে আলাহেদা ফর্দ্দের লিখিত সোনা রুপার জিনিসের বাবদ ওশুল মং ত ৫ টাকা বাদে বক্রি ১৫ টাকা নিকাহা কাত্রম পর্য্যন্ত আদায় করিব এতদার্থে কাবিননামা লিখিয়া দিলাম। ইতি।[৬]

কাবিননামার পরিচিতি

কাবিননামার শুরুতেই বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি বিবাহকে হালাল হারামের পার্থক্যকারী রূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর দরুদ ও সালাম রাসুল মুহাম্মদ (স.) এর পরিবারবর্গ এবং সমগ্র সাহাবীদের ওপর। অতঃপর শরীয়তের বিধান অনুসারে সুন্নত তরীকায় বিবাহকারীর (পাত্রের পরিচয়) নাম, পিতার নাম, জাতি (মুসলমান), পেশা (ব্যবসা, তালুকদারী, জমিদারী), গ্রাম, থানা, জেলার বিবরণ রয়েছে। পাত্র সুস্থ অবস্থায়, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, জোর জবরদস্তিহীনভাবে এবং মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে শরীয়ত মোতাবেক বিয়ের অঙ্গিকার করছে। পাত্রীর পরিচয়ের পূর্বে কতগুলো উপমা যেমনথ— সতী-সাধ্বী, নিষ্পাপ কুলশীলের উল্লেখ আছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক

অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক তার উল্লেখ আছে। নামের পরে তাকে বলা হয়েছে যিনি সম্মানিতা ও পবিত্র। পিতার নাম, জাতি, পেশা, গ্রাম, থানা, জেলার পরিচয় আছে। দু'জন সাক্ষী ও একজন উকিল যাঁরা জ্ঞানবান, পূর্ণবয়স্ক, তাঁদের পরিচয়, গ্রাম, থানা, জেলার উল্লেখ আছে। তারপরে মহর বা মোহরানা, যার অর্ধেক তাৎক্ষণিক আদায়, অর্ধেক বিয়ের পরে আদায়যোগ্য। এর পরে মুসলিম সমাজে প্রচলিত শর্তগুলো লিখিত আছে। ১১টি কাবিননামার শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নেই, শুধু মুসলিম সমাজে প্রচলিত প্রসিদ্ধ ৪টি শর্তের ভিত্তিতে উল্লিখিত মহরে কাবিন লিখে দেয়া হলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাত্রের স্বাক্ষর, মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে একজন মওলানা বিয়ে পড়ান কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে এবং কাজী তা রেজিস্ট্রি করেন। অনেক সময় কাজী মওলানার দায়িত্বও পালন করে থাকেন। পাত্র-পাত্রীর বয়সের কোন উল্লেখ নেই।

দেনমোহর

প্রতিটি কাবিননামায়ই দেনমোহর নির্দিষ্ট করা ছিল। মুসলিম আইন অনুসারে দেনমোহর হচ্ছে স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। বিয়ের চুক্তির অনুষঙ্গরূপে যে অর্থ বা সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীকে দিতে বাধ্য থাকে বা অঙ্গিকার করে সেই অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমোহর বলা হয়।[৭] দেনমোহর দুই ধরনের- (১) আশু দেনমোহর (মুয়াজ্জল) ও (২) বিলম্বিত দেনমোহর (মোওজ্জাল)। কুরআনে আছে, স্ত্রী যদি সৎচরিত্রের হয় তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে মোহর দেবে। সুরা নিসা (১৯: ২৫) ... তাদের মধ্যে যাদের তোমরা উপভোগ করবে তাদের নির্ধারিত মোহর দেবে।[৮] কাবিননামায় সাধারণত দেনমোহরের পরিমাণ এবং আশু ও বিলম্বিত দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। মুসলিম আইন অনুসারে স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ স্বামীর ওপর দেনমোহর প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। দেনমোহর ছাড়া বিয়ে সম্পাদিত হলে তা বৈধ বিয়ে বলে গণ্য হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিয়ের পর উপযুক্ত দেনমোহর স্ত্রীকে দিতে হবে।

বিয়ের মোহর সম্পর্কে কুরআনের বিধান মতে স্ত্রী শুধু বিয়ের মোহর পাওয়ার অধিকার রাখেন এবং স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন। মোহরানার চুক্তি মৌখিক বা লিখিতভাবে সম্পাদিত হতে পারে। এ চুক্তি শুধু লিখিতভাবেই সম্পাদিত হবে এরূপ কোন বিধান নেই। মোহরের পরিমাণ বিয়ের পূর্বে বা বিবাহকালে কিংবা বিয়ের পর নির্দিষ্ট করা যায়।

মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে মোহর দেয়া স্বামীর জন্য আবশ্যিক বা ফর্‌জ্। দেনমোহর নির্ধারণ পাত্র-পাত্রীর আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। হাদিস শরিফে মোহরানার সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে অন্যূন ১০ দিরহাম।[৯] দেনমোহর পরিশোধ করা ইসলামী শরিয়া মতে স্বামীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। তবে স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহরানার দায় থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে স্বামীকে মোহর আদায় করতে হয় না।

উনিশ শতকে বাংলায় সাধারণত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাবিননামা সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্ন শ্রেণীর বিয়েতে সাধারণত কাবিন করা হতো না।[১০] প্রাপ্ত কাবিননামাগুলোর দেনমোহরের পরিমাণ হিসেবে বিচার করলে মধ্যশ্রেণীর কাবিননামাই বেশি। ১৮২৩ সালের জমিদার পরিবারের কাবিননামাটিতে মোহরের টাকার পরিমাণ ৫,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা এবং ৫০,০০০ রৌপ্য মুদ্রা। ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের কাবিননামাতে দেনমোহর ১ লক্ষ সিক্কা, এ ছাড়া প্রাপ্ত কাবিননামার মধ্যে দেনমোহরের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। এর মধ্যে ২২৫ টাকা আছে, আবার ২০০০ এবং ১০,০০০ টাকাও আছে।

১৮৭৬ সালে উইলিয়ম হান্টার কাবিননামা সম্পর্কে লেখেন, প্রথা অনুযায়ী একটি দলিল সম্পাদন করা হয় যাতে ১০০ টাকার মতো একটি অংক পাত্রীর জন্য নির্ধারণ করা হয়। সম্ভ্রান্তদের মধ্যে মুসলিম আইন গ্রন্থ অনুসারে এ দলিলে কিছু আইনগত অধিকার বর্ণিত থাকে।[১১] সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে দেনমোহরের পরিমাণ ছিল ৫০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা লাখ টাকাতেও উন্নীত হতো। এ নিয়মটি প্রচলিত হয়েছিল স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য। দেনমোহর ছিল স্বামীর জন্য একটি বাধ্যবাধকতা, যদিও স্ত্রী এ দায়িত্ব থেকে স্বামীকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করে সচরাচর এ মুক্তি আদায় করা হতো।[১২] গোলাম রহমানের *মোকসুদুল মোমেনিন* ও *স্ত্রী শিক্ষা* গ্রন্থে নারীর জন্য ৩৫টি উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, একজন আদর্শ স্ত্রীর অবশ্যই উচিত স্বামীকে দেনমোহরের দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া। ১৯৯৯ সালে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং মহিলা অধিকার সম্পর্কে উইমেন ফর উইমেন-এর গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে অধিকাংশ বিবাহিত নারী দেনমোহরের টাকা পায় না।[১৩] মো: আবদুর রহিমের গবেষেণায় (বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধিকরণ এবং বিবাহিত নারীদের একটি মতামত জরিপ) দেখা যাচ্ছে, এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ের দিন দেনমোহর আদায় হয় না বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী এককালীন বা আংশিক হারে মোহরানা আদায় করে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৩৩ শতাংশ মোহরানা বিয়ের দিন আংশিক পরিশোধ হয়েছে।[১৪]

প্রাপ্ত প্রত্যেকটি কাবিননামাতেই দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই দেনমোহর কিভাবে পরিশোধ করা হলো তারও কয়েকটি দলিল পাওয়া গেছে। স্বামী স্ত্রীকে দেনমোহরের টাকা শোধ করেছে এমন দলিলে স্ত্রীর স্বাক্ষর রয়েছে। যেমন ১৮৭৯ সালে আফতাব উদ্দিনের স্ত্রী তবাকারুন্নেছা স্বাক্ষরিত দলিলে লিখেছেন:

> দেনমোহরের উল্লেখিত ৮০০০ টাকার মধ্যে আগে ২৩০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েছি, বাকী ৫৭০০ টাকা অদ্য তারিখে ১ খণ্ড কবলা সম্পাদন করলেন। সুতরাং ৮০০০ টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র রশিদ লিখিয়া দিয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে উক্ত দেনমোহরের টাকার জন্য আমি কি আমার ওয়ারিশরা কোন দাবি দাওয়া করিতে পারিব না। উল্লেখিত মোহরানার টাকা হইতে আপনি পরিমুক্ত হইলে এতদর্থে সজ্ঞানে স্বেচ্ছাধীন সরল অন্তরে অত্র রশিদ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১৩১৬ সাল ২১ জৈষ্ঠ্য ইং ১৯০৯ সন ৪ জানুয়ারি (বিয়ে ১৮৭৯)।[১৫]

১ আনা স্টাম্পের উপর স্ত্রী স্বাক্ষর করেছেন। যেহেতু দেনমোহর অবশ্যই দিতে হয়, তাই দলিল করে লিখে দিয়েছেন। যদি পরিশোধ করা না হতো তা হলে হয়তো স্ত্রীর পিতৃপক্ষের উত্তরাধিকারীগণ দাবি করতে পারে এমন আশংকা থেকে স্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত নিয়েছেন। কেননা আমরা দেখতে পাই স্বামী আতাহার উদ্দিনের মৃত্যুর পর স্বামীর পিতৃপক্ষের উত্তরাধিকারীগণের কাছ থেকে স্ত্রী আসমান্নেছা খাতুন দেনমোহরের ১০ হাজার টাকা আদালতের মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর সঙ্গে মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর বনিবনা না হ'লে ফয়জুন্নেছা পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং দেনমোহরের ১ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা কোর্টের মাধ্যমে আদায় করেন। তাঁর মোহরানার ১ লক্ষ টাকার পরিবর্তে গাজী চৌধুরী পশ্চিমগাঁওয়ে তাঁর সম্পত্তি সমর্পণের মাধ্যমে তা পরিশোধ করেছিলেন। ফয়জুন্নেছার ওয়াক্‌ফ্ দলিলে উল্লেখ রয়েছে:

> আমার পিতামাতা ও স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামী মহছুফের প্রদত্ত মোহর মোয়াজ্জেলের পরিবর্তে প্রাপ্ত এবং সোপার্জিত জমিদারী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমার মালিকি ও দখলদারিত্বে নিযুক্ত ছিল ও আছে।[১৬]

১৮৬৫ সালে কাবিননামায় লিখিত আছে,

> আমি আশ্বস্ত করিতেছি যে বাকী অর্ধেক মোহরের বর্ধিত লাভসহ প্রদত্ত হইবে তা কাবিননামায় লিখিয়া দিলাম। অবশ্য সতী-সাধ্বী নারী তার পূর্ণ মোহরের মালিক হইবে এবং তা বংশ পরম্পরায় ভোগ করিবে। এ ব্যাপারে আমার কোন দাবি বা আপত্তি নাই।[১৭]

দেনমোহর অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে এবং এর জন্য স্ত্রীর পরিবার থেকে একটা চাপ থাকত। কেননা, প্রায় অনেক কাবিননামাতেই আলাদাভাবে দেনমোহরের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে শর্ত দেওয়া আছে। সোনিয়া নিশাত আমিনের বক্তব্য অনুযায়ী নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করে স্ত্রীর কাছ থেকে দেনমোহর মাফ করিয়ে নেওয়া হতো। ১৮৭৯ সালের সফিউদ্দিনের কাবিননামায় হয়তো সে কারণে শর্তে লেখা আছে:

> দেনমোহরের বাকী টাকা আদায় অথবা মার্জনা সম্বন্ধে অত্র কাবিননামার পৃষ্ঠে ওয়াশিল লেখা অথবা বিবি মুচকুরার ওয়ারীশগণ স্বাক্ষী থাকা রেজিস্ট্রিযুক্ত এবরানামা ভিন্ন অন্য কোন দলিল প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না।[১৮]

আসমন্নেসা খাতুনের কাবিননামার অংশ,

> মোহরানার টাকা ওয়াশিল ফি মাফ সম্বন্ধে আপনার স্বাক্ষরিত ও আপনার অলিগণের বর্তমান যদি তাহাদের অথবা অলি সাহেবের অবর্তমানে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র সম্মতিসূচক রেজিস্ট্রিযুক্ত নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোন দলিল গ্রাহ্য হবে না।[১৯]

অন্যত্র উল্লিখিত,

> উল্লিখিত ২০০০ টাকা দেনমোহরে সম্পূর্ণ কি তাহার কোন অংশ আপনি তলব করিলে তাহা বিনা ওজরে আদায় করিবো। কথিত দেনমোহরের টাকা আপনার মাতৃপিতৃ বংশীয় তৎকালীয় প্রধান অলির সাক্ষাত ও স্বাক্ষরিত দলিল ভিন্ন মাফ নেওয়ার দাবি করিতে পারিবো না।[২০]

অধিকাংশ কাবিননামায় দেনমোহর আদায়ের ক্ষেত্রে আলাদা শর্ত ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮২৩ সালের বলিয়াদির জমিদার হোসেনউদ্দিন ও মুকিমপুরের সৈয়দ নেজাবত আলীর কন্যা আশরাফুন্নেছার কাবিননামায় দেনমোহর নির্দিষ্ট হয়েছে ৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ৫০,০০০ রৌপ্য মুদ্রা; নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরীর দেনমোহর ১,০০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব ফরিদুন জা-এর কন্যা গুলশান উন নেছার সঙ্গে লক্ষনৌর আমির বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ তাকির বিয়ের দেনমোহর নির্ধারিত হয়েছিল ১ লক্ষ সিক্কা। মাজেদা সাবেরের মাধ্যমে জানা যায়, বেগম রোকেয়ার বড় ভাই খলিলুর রহমান আবু সাবের ও নাটোরের জমিদার কন্যা আমেতবাতুল সাবেরের বিয়েতে ১,০০,০০০ টাকা ও ৫০০ বিঘা জমি দেনমোহর ধরা হয়েছিল। বেগম সুফিয়া কামাল এবং নেহাল হোসেনের বিয়েতে ৫০,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছিল।

দেনমোহরের পরিমাণ সামাজিক প্রতিপত্তির ওপর নির্ভর করতো। জমিদার পরিবারের বিয়েতে নির্ধারিত দেনমোহরের পরিমাণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও নির্দেশ করছে। সেই হিসেবে আমাদের প্রাপ্ত অন্য কাবিননামাগুলোতে ১০০০০-এর বেশি দেনমোহর নেই। হান্টার কথিত ১০০ টাকার দেনমোহরের সঙ্গে তুলনা করলে প্রাপ্ত কাবিননামাগুলোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাবিননামা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই শ্রেণীর কাবিনানামায় বিধৃত শর্তাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

স্ত্রীর বিনানুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে

স্ত্রীর বিনানুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না এই শর্ত প্রায় সব কাবিননামায় পাওয়া যাচ্ছে: যেমন ১৮২৩ সালে হোসনেউদ্দিন চৌধুরীর কাবিননামায় উল্লেখ আছে "আপনার বিনানুমতিতে দ্বিতীয় বিবাহ কি নিকাহ করিতে পারিব না।[২১]

১৮৭৯ সালে সফিউদ্দিন-এর কাবিননামায় উল্লেখ আছে

> খাতুন মুজকুরার বিনানুমতিতে অন্য বিবাহ কি নিকাহ করিতে পারিব না। তাহার অনুমতি গ্রহণ করিলে নব্য বর্ণিত খাতুন মুজকুরার আজ্ঞাসীন হইয়া সেবাই নিযুক্ত থাকিবে। নব্য স্ত্রী খাতুন মুজকুরার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ও সেবা অস্বীকার করিলে তৎপতি তালাক বায়েন প্রকাশ পাইবে। তাহাকে গৃহে রাখিয়া গৃহবাস করা মোহাম্মদী শাস্ত্র মতে অপবিত্র হইবে এবং তাহার গর্ভজাত কোন সন্তান থাকিলে তাহারা আমার ত্যাজ্য বস্তু উত্তরাধিকারী হইবেক না ও সন্তানদের বরাবরে আমি আমার সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন দলিল লিখিয়া দিলে তা গ্রাহ্যনীয় নহে।[২২]

দ্বিতীয় বিয়েকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এমনকি গোপনেও যদি বিয়ে করে ফেলে সে ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী থাকবে না। যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে সেই স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত থাকবে এই প্রথা সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত 'খাদিমা' প্রথার অনুরূপ। দ্বিতীয় স্ত্রী, এমনকি তার সন্তান সম্পত্তি পাবে না এই শর্ত স্পষ্ট করে দেয় যে, কি কারণে বেগম রোকেয়া তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

হাফিজউদ্দিন মৃধার কাবিননামায় উল্লিখিত, "প্রস্তাবিত ভার্যার সহিত বিবাহ বন্ধন স্থীরতর থাকা পর্যন্ত অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না।"[২৩]

১৯১৪ সালে নাজিম উদ্দিন আহমেদের কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

> আপনার অনুমতি ব্যতিত অন্য বিবাহ কি নিকাহ করিতে পারিব না। করিলে উক্ত স্ত্রী আমার পক্ষে হারাম হইবে ও তৎগর্ভজাত সন্তান আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না।[২৪]

ইসলামে যেখানে ৪ স্ত্রী বৈধ করেছে, সেখানে দ্বিতীয় বিয়ে করলে হারাম হবে অর্থাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এই কাবিননামার মাধ্যমে।

১৯০৮ সালে আতাহার উদ্দিনের কাবিননামায় উল্লেখ আছে,

> বিবি মুজকুরার সহিত বিবাহ বন্ধন স্থীরতর থাকা পর্যন্ত অন্য বিবাহ বা নিকাহ করিতে পারিব না। খোদা না করুন যদি বিবাহ বা নিকাহ করি তবে আমার ক্ষমতায় ক্ষমতাবতী হইয়া বিবি মুজকুরা তাহাকে তিন তালাক বায়েন দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিবেন।[২৫]

উনিশ শতকের শেষ দিকে হাছিনা বানু এই তালাক বায়েন প্রয়োগ করে মোহাম্মদ মিয়ার গোপনে বিয়ে করা স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। কারণ তার কাবিনে লেখা ছিল যতদিন হাছিনা বানু জীবিত থাকবেন ততদিন আর কোন বিবাহ করতে পারবে না। হাছিনা বানু তার এই অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন।[২৬]

জয়নাল হক সিকদারের কাবিননামায় উল্লিখিত:

> যদি মুজকুরা চিররুগ্না বা বন্ধা বা অন্য কারণে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করার অনুপোযুক্ত হন তাহা হইলে আমার দ্বিতীয় বিবাহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।[২৭]

স্ত্রীর অধিকারের পাশাপাশি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকারও সংরক্ষিত রয়েছে। তবে স্বামী চিররুগ্ন কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম হলে স্ত্রীর পক্ষে কোন শর্ত নেই।

শেখ বেহারীর কবিননামায় উল্লেখ্য শর্ত:

> 'তবে, ...' বিনা অনুমতিতে বিয়ে করিব না। যদি দ্বিতীয় বিয়ে আবশ্যক হয় তবে দেনমোহরের টাকা আদায় করিয়া খোরপোশের রিতিমত বন্দবস্ত করিয়া এবং বিবি মুজকুরাকে রাজি করিয়া নিকা করিব।[২৮]

অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে,

> বিনা অনুমতিতে উপপত্নি কি নিকা করিব না। যদি করি তবে তোমার ইচ্ছায় থাকিয়া ভরণপোষণ দিয়া যাইবো।[২৯]

এ থেকে বুঝা যায় স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর পুনর্বিবাহে বাধা ছিল। ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে যাই থাক, স্ত্রীর এই অধিকার মধ্যবিত্ত পরিবারে সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল। এই বিধানে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামী আবার বিয়ে করতেন না। কিন্তু অনুরূপ সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর

অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কেন এতো বহু বিবাহ হতো?

ভরণপোষণ/খোরপোশ

কাবিননামার দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল খোরপোশ তথা ভরণপোষণ নিয়ে। ভরণপোষণের টাকা সাধারণত অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হতো। নারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রায় প্রতিটি কাবিননামায় এর উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে 'খোরাকিনামা' বা 'একরারনামা' নামে চুক্তিপত্র পাওয়া গিয়েছে। কখনো পাত্র নিজে অঙ্গীকার করছে, কখনো পাত্রের পিতা অঙ্গীকার করছে ভরণপোষণের বিষয়ে। যেমন, ১৮৭৯ সালে শেখ সাফির কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

> ভদ্র শোভন ন্যায় তোমার ভরণপোষণ ও থাকিবার স্থান বিনা ওজরে দিব ও তোমাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না কিংবা অপর কোন নিকাহ বা বিবাহ করিব না। যদি করি তাহা হইলে তুমি আপন মাতা পিতার বাড়ীতে থাকিয়া ভরণপোষণের সমস্ত খরচ আমার নিকট হইতে লইবে। তাহাতে আমার কোন ওজর আপত্তি চলিবে না।[৩০]

আফসনবিবির কাবিননামায় উল্লিখিত:

> ... তোমাকে তোমার পিতার আলয়ে রাখিয়া তোমার খোরাকি দিয়া তোমার সহিত পুরুষের ন্যায় ঘরকন্যা করিতে থাকিব। ... যদি তোমার সহিত বনিবনা না হয় তবে যে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিবেক ঐ স্থানে পর্দ্দার সহিত রাখিয়া তোমার উক্ত নিয়মিত খোরাকির টাকা মাসিক ৪ টাকা করিয়া দিয়ে তোমার সহিত ঘরকন্যা করিতে থাকিব। আমি আপন ইচ্ছা মতো তোমাকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিব না। তোমার নিয়মিত খোরাকির টাকা না দিই তবে তুমি আমার নামে আদালতে নালিশ করিতে পারিবে এবং আদায় করিয়া লইতে পারিবে।[৩১]

১৮৭৯ সালে স্বামীর পিতা শেখ মস্তাফা খান একরারনামায় উল্লেখ করেছেন:

> মোহাম্মদী সরা মতে তোমাকে বিবাহ করিয়া রিতিমত কাবিন লিখিয়া দিয়াছে। তোমার বরাবরে একরারনামা লিখিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতে ভরণপোষণ আমি নিজে করিব। আল্লাহ না করে যদি ভবিষ্যতে বনিবনা না হয় তবে তুমি আপন পিতামাতার আলয়ে বা অন্য স্থানে থাকতে ইচ্ছা কর উক্ত স্থানে মাসিক ৫ টাকা খোরাকি দিব। যদি না আদায় করি তবে আদালত হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে এবং আমার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।[৩২]

১৮৭৯ সালে শেখ ডিঙ্গার কাবিননামায় উল্লেখ রয়েছে,

> আমি তোমাকে রিতি অনুযায়ী বিবাহ করিয়া ঘরকন্যা করিতেছিলাম। তাহাতে আমি অন্য একটি নিকাহ করিয়াছি বিধায় তুমি আমার নিকট খোরপোস চাহিয়া লিখিয়াছ। তাই আমি স্বীকার হইয়া মাসিক ৭ টাকা হিসেবে তোমাকে খোরপোস দিব। তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী স্থানে থাকিবে। যদি খোরপোসের টাকা আদায় না করি তা হইলে আদালতে নালিশের দ্বারা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আমার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। এতদ্বার্থে সুস্থ শরীরে ইচ্ছা পূর্বক অত্র খোরাকি পত্র লিখিয়া দিলাম।[৩৩]

১৯০৮ সালে আতাহার উদ্দিন লিখেছেন,

> আমি কোন কারণে কার্যে স্থানান্তর গেলে তদাবস্থায় আপনি যথায় অবস্থান করিবেন তথায়ই মাস মাস খোরপোস বাবদ প্রস্তাবিত ২৫ টাকা দিতে বাধ্য থাকিব। যদি উপরোক্ত টাকা পাঠাইতে কোন ত্রুটি করি তবে আমা হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।[৩৪]

অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে:

> তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো' কুরআনের এই নির্দেশের যুক্তিতে সতিসাদ্ধী স্ত্রীর জীবন যাপনের দায়িত্ব পালন করবো এবং সাধ্যমত খোরপোস প্রদান করবো এবং আসবাবপত্র প্রদানে সচেষ্ট থাকবো।[৩৫]

১৯১৫ সালে নজিমউদ্দিন কাবিননামায় উল্লেখ করেছেন:

> খোদা না করুন যদি কোন কারণ বশত আমার কি আমার আত্মীয়সজনের সহিত আপনার অবর্গ (বনিবনা) না হয় তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী পিতৃ মাতৃ কুলের ঘনিষ্ট আত্মীয়ালয়ে থাকিতে পারিবেন ও তথায় মাসিক ১০ টাকা হিসেবে খোরাকি দিয়া তথাতেই দাম্পত্য স্বত্য রক্ষা করিব। তৎকালিন এমত কোন আপত্তি করিতে পারিব না যে আমার গৃহে বাস না করিলে খোরপোসের নির্ধারিত টাকা দিব না।[৩৬]

হাফিজউদ্দিনের কাবিননামার অংশবিশেষ:

> যদি খোরপোস না দেই ও তত্ত্বকতা না লই ও লইতে আলশ্য করি তবে জনৈক পরিশিষ্টসহ বিশিষ্ট লোকের উপযুক্ত মতো খোরপোস আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পতি দ্বারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।[৩৭]

গোলাম মাওলার কাবিনে উল্লিখিত শর্ত:

> খোদা না করুণ আমার সহিত বনিবনা না হয় তবে তাহার জন্য আলাদা হাবিলিয়া করিয়া দিব এবং মাস মাস ১৫ টাকা করিয়া খোরপোস দিব।[৩৮]

১৯৩৮ সালে ফজলুর রহমান কাবিননামায় উল্লেখ করেছেন:

> আপনাকে সরা-শরিয়ত মতো রাখিব ও খোদা চাহেতো কোনরূপ আপনার শারিরিক বা মানসিক কষ্টের কারণ হইব না। খোদা না করেন যদি এইরূপ কোন কষ্ঠের কারণ ঘটে তবে আপনি আপনার পিত্রালয়ে থাকিয়া আমার নিকট হইতে খোরপোস বাবদ মাসিক ৩০ টাকা হারে মাসোহারা দাবি করিতে পারিবেন এবং আমি আইনত বা ধর্মত তাহা দিতে বাধ্য থাকিব। ইহাতে আমার কিম্বা আমার কোন ওয়ারিশের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।[৩৯]

ভরণপোষণের যেসব শর্ত কাবিননামাগুলোতে পাওয়া যায় তা বর্তমান বিধানের তুলনায়ও নারীর প্রতি অনুকূল। আজীবন ভরণপোষণের শর্ত নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার সামাজিক বিধান বলে গণ্য হতে পারে। যদিও বিবাহ বিচ্ছেদ হলে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনে আজীবন ভরণপোষণের কোন বিধিবিধান নেই।

এই শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছেন না কিংবা স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিচ্ছেন না হয়তো সামাজিক আভিজাত্যের কারণে। সম্ভবত মধ্যবিত্ত পরিবারে তালাকের রেওয়াজ ছিল না। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রীকে দেনমোহরের

সমস্ত টাকা পরিশোধ করতেন এবং আজীবন ভরণপোষণ দিয়ে যেতেন। ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর সঙ্গে গাজী চৌধুরীর তালাক হয়েছিল কিনা সে রকম কোন দলিলপত্র পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা যায় ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হয়তো ভরণপোষণের টাকাও পেতেন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদের পুনর্বিবাহে সামাজিকভাবে হয়তো বাধা ছিল। কেননা, আমরা দেখতে পাই ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী বিবাহ বিচ্ছেদের পরে আর পুনর্বিবাহ করেননি। অন্যদিকে করিমুন্নেছা খানম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খুব অল্প বয়সে বিধবা হলেও পুনর্বিবাহ করেননি। হয়তো বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক এবং পুনর্বিবাহ উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর জন্য অসম্মানের ছিল। এই সব একরারনামা বা খোরাকিনামা পাত্রিপক্ষ পাত্রের কাছ থেকে অথবা পাত্রের পিতার কাছ থেকে লিখিয়ে নিতেন নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে।

পিতা-মাতার বাড়ীতে যাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

১৮৭৯ সালে সফিউদ্দিন উল্লেখ করেছেন:

> কোন দুঃখ-সুখ ঘটিত অথবা মাতা, ভ্রাতা কি ঘনিষ্ট কুটুম্ববর্গ দর্শনোর জন্য বর্ণিত খাতুন মাতৃয়ালয়ে অথবা কুটুম্বালয়ে যাইতে বাঞ্ছিতা হইলে আমি তাহাতে বাধা না করিয়া আমার অর্থ দ্বারা নৌকায় এবং সোয়ারী সময় মতো যখন যাহা প্রচলিত হয় তৎদ্বারা পৌছাইয়া দিব।[৪০]

১৯০৮ সালে আতাহার উদ্দিন উল্লেখ করেছেন:

> আপনার পিতামহের কিয়ৎকাল তাহারা নিজ আলয়ে আপনাকে রাখতে ইচ্ছা করিলে অথবা আমার সহিত কি আমার পরিবারস্থ আত্মীয়গণের কেহর সহিত আপনার কোন বনিবনা না হইলে আপনি নিজ পিত্রালয়ে কি সুবিধাজনক অন্য স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিতে পারিব না এবং তদাবস্থায় যে স্থানে বাস করিবেন সেই স্থানে মাসিক ২৫ টাকা করিয়া খোরপোস দিতে বাধ্য থাকিব এবং আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে আমার নিজ আলয়ে কি অন্য কোন স্থানে যাইতে আপনার আত্মীয়াগণের সম্মানের লাঘবতা জন্মে এমত কোন স্থানে নিতে কি রাখিতে পারিব না। আপনি যখন পিতৃালয়ে বা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন তখনই তাহার যাতায়াত ব্যয় আমি বহন করিতে বাধ্য থাকিব এবং ঐরূপ কোন যাতায়াতে কোন প্রকার বাধা দিব না।[৪১]

১৯১৫ সালে আজিজুল হক উল্লেখ করেছেন:

> শ্রীমতি বিবি মৌসুকাকে তাহার পিতা মাতার বাটিতে কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বের বাটিতে সাধি ও গামিতে যাতায়াত করিতে কখনও নিষেধ করিব না। বিবি মুজকুরাকে আনন্দজনক বা শোকসূচক কোন কার্যে কিংবা মনের প্রফুল্লতা সম্পাদনের নিমিত্তে তাহার পিতৃালয়ে বা আত্মীয় সজনের বাড়িতে যাইতে বাধা দিব না বরং আবশ্যকে নিজ ব্যয়ে তাহাকে মান সম্ভ্রমের সহিত পৌছাইয়া দিব।[৪২]

সৈয়দ ফজলুল হকের কাবিননামার অংশবিশেষ:

> কখনো যদি তাহার পিতা মাতা মহলের আত্মীয় সজনকে দেখতে চায় তবে তার অনুমতি প্রদান করবো। তার দুঃখ বা বিষণ্নতা আরপের মতো কোন কাজ করবো না।[৪৩]

এই শর্ত নারীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়, তার সম্ভ্রম রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তার অধিকার স্বীকার করে।

ভদ্র আচরণ

অপর শর্ত স্বামীর ভদ্র আচরণের প্রতিশ্রুতি। ১৮৭৯ সালে সফিউদ্দিন উল্লেখ করেছেন:

> প্রস্তাবিত ভার্যাকে তাহার মতে পর্দায় রাখিয়া ভদ্রের রিতিমত একত্রে কালযাপন করিব এবং আমি ও আমার আত্মীয়রা বিবি সাহেবের মন রক্ষা করিয়া চলিব ও চলিবেক যদি কোন কার্যবশত আমার আত্মীয়বর্গের সহিত বর্গ (বনিবনা) না পায় এবং সে স্থানে থাকতে ইচ্ছা না করেন তবে তিনি তাহার পিতৃালয়ে কিম্বা ঘনিষ্ট কোন কুটুম্ব স্থানে থাকিতে বাসনা করেন সেই স্থানে রাখিয়া ভদ্রের নিয়ম মতো খোরপোস দিব এবং একত্র থাকিয়া কালযাপন করিব। কোন কারণ বশত ৩ বছর ৪ মাস ১০ দিন নিরুদ্দেশভাবে থাকিয়া অথবা উদ্দেশ্যভাবে থাকিয়া তত্ত্ববাড়ি (খোজখবর) না লইলে ও যাইতে অলস্য ও অবহেলা করিলে বিবি মুজকুরা তাহার ইচ্ছামত আমাকে ত্যাগ করত বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। কথিত খাতুন যদি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন অপরাধ করেন তাহাতে আমি সহৃদ ব্যতিত অসুহৃত মতো কোন কুবাক্য বলিতে কি অন্যথায় ভৎসনা করিতে পারিব না যে তাহাতে তিনি মনে দুঃক্ষিত হন।[৪৪]

অন্যত্র উল্লেখ আছে,

> তোমাকে তোমার সাধ স্বীকার করিয়া বাড়িতে রাখিয়া সমুদয় ভরণপোষণাদি দিয়া পরদার সহিত রাখিয়া ভদ্রলোকের রেওয়াজ অনুযায়ী সহবাস করিতে থাকিব।[৪৫]

শেখ সানরুর কাবিননামায় উল্লেখ করেছেন:

> আপনাকে ভদ্রলোকের আচার ব্যবহারের বহির্ভূত কোন কাজ করতে অনুমতি করতে পারিব না।[৪৬]

নজিমউদ্দিন আহমেদের কামিননামায় উল্লেখ করেছেন, "আমার সতী সাধ্বী স্ত্রীকে কখনো কষ্ট বা দুঃখ প্রদান করব না "।[৪৭]

১৯০৮ সালে আতাহার উদ্দিন উল্লেখ করেছেন:

> আপনার সহিত ভদ্রলোকের ন্যায় শৎ ব্যবহার করিব আপনাকে মনে কষ্ট কি মানহানিকর কোন কাজ করিব না। মহম্মদীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কাজ কি আচরণে বাধ্য করিতে পারিব না।[৪৮]

শ্রীমতি ইন্দন বিবির কাবিননামায়, "ভদ্র আচরণ করবো তোমাকে কখনো মারবো না"।[৪৯]

১৮৭২ সালে শেখ মোহন আলী উল্লেখ করেছেন:

> বিবি মুজকুরাকে পিতা মাতার ও মুরুব্বির বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিব না। যদি অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক বিবেচনা হয় তাহা হইলে তাহার মাতাপিতা ও মুরুব্বিগণকে সাথে লইয়া একত্রে যাইবে। তাহার সম্মতি ব্যতিরেখে বিবি মুজকুরাকে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইন দ্বারা অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিব না। তাহা আমি করিলে অগ্রাহ্য হইবে। ... বিবি মুজকুরাকে মারপিট, জখম ও বেদাত করিব না। পঞ্চজনা ভদ্রলোকের মতো একান্ত থাকিব। আমি যাহা রোজগার করিব তাহা বিবি মুজকুরার হস্তে আনিয়া দিব। এবং তাহার অনুমতিক্রমে খরচপত্র করিব।[৫০]

ভদ্র আচরণ করার লিখিত শর্তও নারীর সম্মান রক্ষার প্রয়াসে রচিত। প্রশ্ন আসে কেন ভদ্রআচরণ করার শর্ত থাকতো? এই শর্তভঙ্গ হলে কিংবা স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে স্ত্রী যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে পারবে, এই বিধান খুবই চমকপ্রদ।

পঞ্চাশটিরও বেশি কাবিননামাতে উল্লেখ রয়েছে, "কোন অপরাধ করলে ৩ বার মাফ করিব, ৪র্থ বার অপরাধে প্রহার করিব, তবে কোন দাগ বা জখম হইতে পারিবে না।"[৫১]

স্ত্রীধন

হিন্দুশাস্ত্র মতে স্ত্রী দানসূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ নিজের ইচ্ছানুযায়ী দান, বিক্রি করতে পারবেন। সে রকম শেখ আবদুল আহাদ হকের কাবিননামায় উল্লেখ রয়েছে:

> "সোনা, রুপার অলংকার যাহা দিলাম ঐ সকল তোমার স্ত্রীধন। ঐ গহনা আমি হস্তগত করিতে পারিব না।"

সোনার নথ	১টি	৮ টাকা
সোনার পাচনবি	১টি	৩০ টাকা
সোনার বালি	১টি	১০ টাকা
চাদার সেট	১টি	১৫ টাকা
চাদার বোটি	১টি	১৬ টাকা
চাদার বাগবাজুরা	১টি	১৫ টাকা
চাদার বাতাসা	১টি	৬ টাকা
	মোট=	১০০ টাকা।[৫২]

শেখ আবু মিয়ার কাবিননামায় উল্লিখিত:

> ১৫৬ টাকার সোনা, রূপা যাহা দিয়েছি তাহা তোমার স্ত্রীধন, তা আমি হস্তগত করিতে পারিব না।

সোনার নথ	১টি	৫ টাকা
সোনার বালি	৬ জোড়া	১৪ টাকা
সোনার ঝুমকা	১ জোড়া	২৪ টাকা
সোনার দানা	১টি	৩৬ টাকা
সোনার পৃন্দায়	১টি	৬ টাকা
সোনার সীতা	১টি	২৪ টাকা
রুপার বাদিয়া পৌচি	১ জোড়া	১০ টাকা
রুপার চূড়	১ জোড়া	১০ টাকা
রুপার বাতাসা	৮ পাড়া	৪ টাকা
রুপার বাজুবন্দ	২ জোড়া	১১ টাকা
রুপার চন্দ্রহার	১টি	১২ টাকা
	মোট=	১৫৬ টাকা।[৫৩]

পান দান বা হাত খরচ

১৯৩৮ সালে ফজলুর রহমানের কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

> আমার অবস্থা অনুযায়ী আপনাকে পান দান বা হাত খরচ হিসেবে মাসিক বরাদ্দ করিয়া দিব। তাহা আপনি যেমন খুশি খরচ করিবেন অথবা জমা করিতে পারিবেন।[৫৪]

ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে অভিজাত পরিবারের নারীরা স্বামীর কাছ থেকে হাত খরচ বা পিন মানি হিসেবে বরাদ্দ পেতেন।

সফর করার অনুমতি এবং তালাক দেওয়ার ক্ষমতা প্রসঙ্গ:

১৮৭৯ সালে সফিউদ্দিন আহমেদ-এর কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

> কোন প্রয়োজন বশত অথবা দেশ ভ্রমণ করার জন্য বিদেশ যাইতে খাতুন মুজকুরার অনুমতি গ্রহণ করিব। আমার বিদেশ থাকাকালে তাহার ভরণ-পোষণ, থাকা ভদ্রশিষ্ট লোকের মতো কালযাপন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবো এবং ছয় মাসের অধিককাল বিদেশ থাকিতে পারিবো না। আর প্রকাশ থাকে এই সকল নিয়মে যদি কোন এক নিয়ম লঙ্ঘন করি তবে খাতুন মুজকুরার ইচ্ছাপূর্বক কথিত দেনমোহরের মুয়াজ্জল ও মওজ্জাল উভয় টাকা একত্র আদায় করিয়া লইতে ক্ষমতাবান হইবেন।[৫৫]

১৯১৪ সালে নজিমউদ্দিন আহমেদ-এর কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

> আমি কি আমার পরিবারস্থ কেহ কর্তৃক আপনার প্রতি কোন প্রকার নির্দয় আচরণ প্রকাশ পাইলে অথবা আমি ক্রমান্বয়ে ৪ বছর পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকিলে কি ৬ মাস পর্যন্ত আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমার নিজ বাটিতে কি চতুর্থ শর্ত অনুয়ায়ী আপনার আত্মীয়ালয়ে থাকিলে তথায় উল্লেখিত মাসিক ১০ টাকা হারে খোরাকি না দিলে অথবা উল্লেখিত শর্ত সকলের কোন এক শর্ত লঙ্ঘন করিলে আপনাকে তালাক দেওয়ার যে ক্ষমতা আছে তৎসমস্ত ক্ষমতা আপনাকে পর্যাপ্ত করা হইল। অর্থাৎ নিজের সর্বপ্রকার তালাক আপনি নিজে দিতে পারিবেন। তাহাতে উক্ত তালাক আমার অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে হওয়া বলিয়া কোন আপত্তি করিতে পারিব না।[৫৬]

সৈয়দ ফারজুল হকের কাবিননামায় দেয়া শর্ত:

> স্ত্রীর বিনানুমাতিতে কোথাও সফরে যাব না। যদি একান্তই জরুরী হয় তবে সফর শেষ করেই স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করিব। আর এ জন্য বাক্যগুলো কাবিননামা আকারে লিখিয়া দিলাম, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে দলিল হিসেবে কাজে আসে।[৫৭]

নুরজান বিবিকে দেয়া অঙ্গীকার, "যদি বিদেশ যাই ৬ মাসের অধিক থাকিব না"।[৫৮]

৬ মাসের অধিককাল স্ত্রীকে স্বামীর সংসর্গ থেকে বঞ্চিত না করার শর্ত নারীর দাম্পত্য জীবনের স্বার্থে করা হয়েছিল। এখানেও নারীর সম্মানের বিষয় জড়িত ছিল।

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা

কাবিননামার অন্যতম শর্ত পাত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত। স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবে। শুধু তাই নয় স্ত্রী অপর স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে এমন শর্ত রয়েছে, যেমন ১৯০৮ আতাহার উদ্দিন-এর কাবিননামায় উল্লেখ আছে:

উল্লেখিত শর্ত মতে কোন এক শর্ত কি অংশ কোন প্রাকার লঙ্ঘন করিলে উপরে লিখিত সমস্ত মোহরানার টাকা অর্থাৎ মুয়াজ্জল কি মোওজ্জল করিয়া একত্রে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এবং শর্ত লঙ্ঘন দরুন আদালতের দ্বারা তাহার প্রতিকার লইতে পারিবেন। অধিকন্তু প্রস্তাবিত প্রথম শর্ত লঙ্ঘন করিয়া যদি অন্য বিবাহ করি তবে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আমার যে ক্ষমতা আছে ঐ ক্ষমতা চিরদিনের জন্য আপনাকে অর্পন করিয়া ক্ষমতা দিতেছি যে আপনি ঐ ক্ষমতা ব্যবহারে উক্ত স্ত্রীকে তালাক বায়েন করিতে পারিবেন এবং তাহা আমার নিজকৃত কার্য ন্যায় কার্যকরী হইবে।[৫৯]

মূল্যায়ন

উনিশ শতকের সাহিত্যে দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না; তবু ধর্মীয় অনুশাসনে মুসলমানদের পত্নীসংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য সর্বদা এ অনুশাসন গ্রাহ্য হতো না। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীদের বাইরে উপপত্নী রাখার ও দাসী সম্ভোগের বিষয়টি দেখা যায় সরকারি নথিতে। নিম্ন বর্গের মুসলমানদের, বিশেষ করে ঢাকা, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এত সংখ্যক বিয়ে এবং তালাক হতো যে, তাদের কোন লিখিত প্রমাণ থাকতো না। ১৮৭২ সালে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট পাশের পর পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মুন্সী আমজাদ আলীর বিবেচনায় উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ ছিল।[৬০]

উনিশ শতকে মুসলিম পরিবারে বহুবিবাহ অতি সাধারণ ঘটনা, বহুবিবাহের সাথে সাথে তালাকও খুব বেশী হতো। নোয়াখালীর ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায়, নিচ শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ খুব বেশী প্রচলিত।[৬১] নিম্নশ্রেণীর মুসলমান নারী তালাকপ্রাপ্ত হলে কিংবা বিধবা হলে তার পুনর্বিবাহ হতো। কিন্তু উচ্চশ্রেণী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান পরিবারে নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে কিংবা বিধবা হলে পুনর্বিবাহ খুব বেশী দেখা যেত না। যেমন, ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, করিমন্নেছা খানম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

আমরা যে ১২৩টি কাবিননামা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি, তা থেকে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে প্রায় শতাধিক বছরের প্রচলিত স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের বিষয়টি জানা যাচ্ছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রচলনের পূর্বে পাত্রীর অধিকার ছিল খুবই সীমিত এবং পুরুষের অধিকারের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু প্রাপ্ত কাবিননামার শর্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর অধিকার রক্ষার কতকগুলো ব্যবস্থা এতে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এইসব শর্ত কতখানি পালন করা হতো? দেনমোহরের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রমাণ পাওয়া, তা থেকে এমন অনুমান অসংগত নয় যে, শর্তগুলো পালনীয় ছিল এবং তা পালিত হতো। স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না; খোরপোস বা ভরণপোষণের শর্ত ছাড়াও পান দান/নাস্তা বাবদ মাসিক বরাদ্দ

ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে একত্র না থাকলেও আজীবন ভরণপোষণ দিতে হবে— এমন শর্ত বলে দিচ্ছে নারীর অধিকার কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল; স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার কাবিননামায় সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ছিল; পিতামাতার, কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যাওয়ার অধিকার; স্বামী সফর করলে অনুমতি নিয়ে সফর করতে হবে; স্ত্রীর সাথে ভদ্র আচরণ করতে হবে প্রভৃতি নারীর অধিকারসমূহ পরিবারে নারীর সম্মানজনক অবস্থা প্রমাণ করে। অন্যদিকে, স্ত্রী চিররুগ্না, বন্ধ্যা, কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম হলে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার ক্ষমতা থাকবে এবং অনেক কাবিননামায় উল্লেখ আছে কোরআনের আইন অনুযায়ী স্ত্রীর ত্রুটিতে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারবে, তবে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে শরীরে কোন ক্ষত না হয়।

কাবিননামায় স্ত্রীর উপরিবর্ণিত অধিকার থেকে বিশেষভাবে আমাদের ধারণা জন্মে যে, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার যে বিধান, এক সঙ্গে বসবাস না করলেও স্ত্রীকে আজীবন ভরণপোষণ দানের ব্যবস্থা, স্বামীর তালাকের অধিকার প্রয়োগ করে স্বপত্নীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ বাতিল করার অধিকার প্রভৃতি ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাবিননামায় এগুলোর পুনঃপুনঃ ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, ধর্মীয় বিধিবিধানের বাইরেও বাঙালি মুসলিম সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিধি- বিধান গড়ে উঠেছিল এবং তা দেশের নানা অংশে পালন করা হতো। এ থেকে অন্তত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে দাম্পত্য অধিকারের যে চিত্র পাই তা নারীর পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক। কাবিননামার শর্তাবলি যে পূরণ করা হতো তারও নানা প্রমাণ আমরা পাই। সুতরাং এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, কাবিননামাগুলো ছিল নিছক লিখিত দলিল যার কোন প্রায়োগিক মূল্য ছিল না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আলোচ্য সময়ের বাঙালি মুসলিম দাম্পত্য জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র তুরে ধরার জন্য কাবিননামাই একমাত্র সূত্র হতে পারে না। তবে আমাদের গবেষণায় সূত্র হিসেবে কাবিননামার যে একটা গুরুত্ব আছে সেটিও অবশ্য স্বীকার্য। নারীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এই লিখিত শর্তগুলো তার অধিকার সংরক্ষণের। পাশাপাশি এই শর্তগুলো কি নির্দেশ করছে না যে, সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাম্পত্য জীবনে নারীর অধিকার সুরক্ষিত ছিল না? নারীর অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার লক্ষেই অনেকসময় ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে একটা সামাজিক বিধি তৈরি হয়েছিল।

কাবিননামাগুলো দীর্ঘ সময়ে রচিত এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত বিধায় এর শর্তগুলোর মধ্যে যে এক ধরনের সর্বজনীনতা আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ-সব কাবিননামা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে স্ত্রীকে যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সে অধিকারের অধিকাংশই উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা ভোগ করে আসছিলেন।

কাবিননামার পরিচিতি (কালানুক্রমিক)

১৮২৩, আফসারুন্নেছা খাতুনের সঙ্গে হোসেনুদ্দীন চৌধুরীর কাবিননামা। বলিয়াদি, টাঙ্গাইল জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত।

১৮৬৩, ইছারউদ্দিন বিন মুয়াজ্জম আলী বিনতে মুয়াজ্জম আলীর সঙ্গে মোসলেম বিন চৌধুরীর (নামটা মুছে গিয়েছে) কাবিননামা। সাভার, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৬৫, মো. নুরুল এসলাম ইবনে জুলফিকার আলী খানের সঙ্গে শায়েস্তা খাতুন বিবির কাবিননামা। সাভার, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৭১, আবদুল হক, পিতা হায়দার মাহমুদ-এর সঙ্গে মোহাম্মদ জোবেদা বানুর বিয়ের কাবিননামা। সিলেট, মজুমদারের পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৭২, মো. আফতাবউদ্দিন বিন জহিরউদ্দিনের সঙ্গে নাসিমুন্নেসার বিয়ের কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৭৪, লাল মিয়ার সঙ্গে আমিরুন্নেসার কাবিননামা। আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৫, গুলশানউন্নেছার সঙ্গে আমীর বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মাদ তাকির বিয়ের কাবিননামা। মুর্শিদাবাদ, হাজার দুয়ারি প্যালেসে রক্ষিত।

১৮৭৯, মো. আফতাবউদ্দিন বিন জহিরউদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি তবকোরুন্নেসা বিবির কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৭৯, সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি জয়নব বিবি, শ্রীযুক্ত সাফি, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আর্শিবাদ দেবী, শ্রী শেখ এলাহী, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, সেবিকা শ্রীমতি মোছাম্মাদ আফসরন বিবি, শ্রী শেখ সানরু, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি জয়নব বিবির সাথে শ্রী সফী খাঁর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মোছা আফচরন বিবির সাথে শ্রী শেখ সানরুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, মোছা আকছনের সাথে শেখ আবদুলের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, নখিরুন নেছার সাথে শ্রী শেখ ডিঙ্গার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি এছা বিবির সাথে শ্রী শেখ আবু মিয়ার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, এছা বিবির সাথে শ্রী শেখ মেও খানছামের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, নূরজান বিবির সাথে শ্রী শেখ আবদুল বারি হাক্কার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নুবাজান বিবির সাথে শ্রী দুক্ষুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি খাতুন নেসার সাথে শ্রী শেখ বেহারির কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি জয়নাব বিবির সাথে শ্রী শেখ গোলাম হাসানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ছামসুন বিবির সাথে শ্রী শেখ আবদুল আহাদ হকের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি কামরুন নেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ মাহিব রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আজিজনেছা বিবির সাথে শ্রী মাহবুব আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ইন্দন বিবির সাথে শ্রী শেখ আজগরের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি অহিদান নেছার সাথে শ্রী নশীর উদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি খদিজা বিবির সাথে শ্রী আব্দুল হোসেনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি রাতন বিবির সাথে শ্রী শেখ আবুল ছামাদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি কানিজ ফাতেমা বিবির সাথে শ্রী রোস্তম খার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মানু বিবির সাথে হাজী ওলাদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আছিরনের সাথে শ্রী শেখ রুপূই-র কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মজিবান বিবির সাথে শ্রী শেখ আস্মুতের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি সাতেব বিবির সাথে শ্রী আকবরের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি সেতু বিবির সাথে শ্রী মির কোরবান আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মনিষা বিবির সাথে শ্রী শেখ হুসেনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিহ খোরশেদের সাথে শ্রী শেখ এতবারির কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মেথু বিবির সাথে শ্রী শেখ পাওলাদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ভূবন বিবির সাথে শ্রী শেখ বাবু পাতীকের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি তারা বিবির সাথে শ্রী উদয়ের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি মোহারানের সাথে শ্রী আবদুল গফুরের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি জয়নবের সাথে শ্রী শেখ বেচুপতীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বেনি বিবির সাথে শেখ পীরুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি হারীমন নেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ চাঁদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি উদিরন নেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ আমান খাঁর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিনয়ির সাথে শ্রী শেখ ওরাফের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আজিমন নেছার সাথে শ্রী মাহবুব আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি টুনি বিবির সাথে শ্রী শেখ আতাহার রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি খাতু বিবির সাথে শেখ রোমাজের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি কাশীমনেছা বিবির সাথে শ্রী রমানামের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি মেহের নেগার এর সাথে শ্রী শেখ আবদুর রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নার্গিস বিবির সাথে শ্রী শেখ হেদাওল্লার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি তিনাম বিবির সাথে শ্রী শেখ জানেব মার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আয়শা বানুর সাথে শ্রী শেখ বাবু জানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, আল্লারাখি বিবির সাথে শ্রী শেখ দীদারবক্সের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ছমরুম বিবির সাথে শ্রী শেখ কফিমুদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বানুর সাথে শের আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি মরিয়মের সাথে শ্রী গোলাম হোমোর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি জমিরন বিবির সাথে শেখ আবু মণ্ডলের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি সামিমা নেছা বিবির সাথে এবজন মণ্ডলের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মেহেরজান নেছার সাথে শেখ গাবুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি কুলসুম বিবির সাথে শেখ এ রাহিবকের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি হুবু নেছা বিবির সাথে আজিজুর রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি খায়রানের সাথে শ্রী শেখ ওদনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি বদিয়ন নেছার সাথে শেখ মহন আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি শুক্লা দেবি রত্তার সাথে শ্রী তারা চাঁদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বেহুর সাথে শ্রী শেখ মালীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নছিবন নেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ আবদন রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মনা বিবির সাথে শ্রী শেখ সেখুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ছমছম বিবির সাথে শ্রী শেখ কদিমুদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নাজবন বিবির সাথে শ্রীযুক্ত শেখ বেদুর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি রহিমন নেছা বিবির সাথে শ্রী বাবুর আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মোহবন নেছা বিবির সাথে শ্রী আলী জামের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বেত্তাদে বিবির সাথে শ্রী শেখ চন্দ্র ওরফে চাঁদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি সনিমন নেছার সাথে শ্রী শেখ আবদুল নবির কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি মরিয়ম বিবির সাথে শ্রী শেখ হোসেনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নুরজান বিবির সাথে শ্রী শেখ আব্দুল বারি হকাকার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ওনকাতের সাথে শ্রী শেখ মালয়ের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আব্দুন নবীর সাথে শ্রী শেখ এতবারি চৌধুরীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ছকিনা বিবির সাথে শ্রী আবুল রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি হানি সোনানেছার সাথে শ্রী শেখ জাবিবদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ওনাকত বিবির সাথে শ্রী শেখ মলয়ের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি নমিমোন নেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ সামের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বৈচি বাদবাসের সাথে শ্রী আবদুল গনির কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ইদসনেছা বিবির সাথে শ্রী শেখ নুবাযাফ ওনাদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি ত্রিনব বিবির সাথে শ্রী শেখ গোপাল মোহাম্মদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি তোতা বিবির সাথে শেখ আম্মীরের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি জোবেদা খাতুনের সাথে মুহমদ ওসমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি খোশ বিবির সাথে শেখ গোলাম রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি অলকজান বিবির সাথে শ্রী শেখ রজবের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি গঙ্গামতি দাসীর সাথে শ্রী হাবাবু রায়ের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি বিবি খায়রুন নেছার সাথে শ্রী আব্দুল আজীজ-এর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি আনতশী বিবির সাথে শ্রী মহিনা চন্দ্র রায়ের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি হাফিজন নেছা বিবির সাথে শ্রী মলুমের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি অনুক বিবির সাথে শ্রী রেয়াজ উদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি হারামনি দাসির সাথে শ্রী হরিস চন্দ্র দাসের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৭৯, শ্রীমতি কালিগঙ্গা দেবীর সাথে শ্রীযুক্ত লক্ষি নারায়নের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি বিরাজমতি দাসীর সাথে শ্রী তোনাক আহমেদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি জহুরন নেছা বিবির এর সাথে শ্রী শেখ এছমাইলের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি খববন নেছার সাথে শ্রী শেখ পওনাদের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি ফেনাবি বিবির সাথে শ্রী শেখ সমউদ্দিনের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি বিন্দু বিবির সাথে শ্রী শেখ জাফরের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৫, শ্রীমতি বিনাশী বিবির সাথে শ্রী শেখ খলিল রহমানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, বিবি তাহেরুন নেছার সাথে শ্রী শেখ মকবুলের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি মুজানি বিবির সাথে শ্রী শেখ জানি কাছার কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি ছাদকির সাথে শেক হারানের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি রহিমন নেছা বিবির সাথে শেখ গফুর আলীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি অহিদাননেছার সাথে শ্রী নশীরদ্দীন দরজীর কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি হরি দাসীর সাথে শ্রী বারাকৃষ্ণের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৮৮৬, শ্রীমতি কামিনী বিবির সাথে শ্রী শেখ তারিক সরদারের কাবিননামা, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

১৯০৭, হাফিজউদ্দিন মৃধার সঙ্গে রাবিয়া খাতুন। ষোলঘর ভুই, ঢাকা

১৯০৮, আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৯১০, মুহাম্মদ ফয়সাল খানের সঙ্গে আয়শা সিদ্দিকার বিয়ের কাবিননামা। ঢাকা।

১৯১৩, গোলাম মাওলার সঙ্গে আসাদুন্নেসা উম্মে জোহরা ফাতেমা খাতুন। মাদারিপুর।

১৯১৪, নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৯১৫, মুহাম্মদ আজিজুল হকের সাথে কেনিজ খাতুন বিবির কাবিননামা। শান্তিপুর, নদিয়া, অধ্যাপক হোসনে আরার নিকট থেকে প্রাপ্ত।

১৯১৬, মোঃ আবুল কালামের সঙ্গে মোসাম্মদ খায়রুন্নেছা বেগমের বিয়ের কাবিননামা। ঢাকা।

১৯১৭, আবদুল আব্বাস মো. আবদুল আলীর সঙ্গে সৈয়দা হাবিবুনন্নেসা খাতুন। আরজুগঞ্জ, ঢাকা।

১৯২৪, সৈয়দ ফারুজুল হকের সঙ্গে মোসাম্মদ হামিদা বানু। সিলেট, মজুমদার পরিবার।

১৯৩৮, মৌলবী আবু সাইদ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে জিনাত মহল সাবিহা বেগমের কাবিননামা। ফরিদপুর।

১৯৩৮, মো. ইয়াকুব আলী খানের সঙ্গে মাহবুবা বেগমের কাবিননামা। ঢাকা।

১৯৩৯, জয়নাল হক সিকদারের সঙ্গে জহুরা খানমের কাবিননামা। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

মোট ১২৩টি কাবিননামার মধ্যে উনিশ শতকের ১১১টি এবং বিশ শতকের ১২টি।

পরিশিষ্ট ১

১৮৬৫- শ্রী নূরল ইসলামের সঙ্গে শায়েস্তা খাতুন বিবির বিয়ের কাবিননামা।

পরিশিষ্ট ২

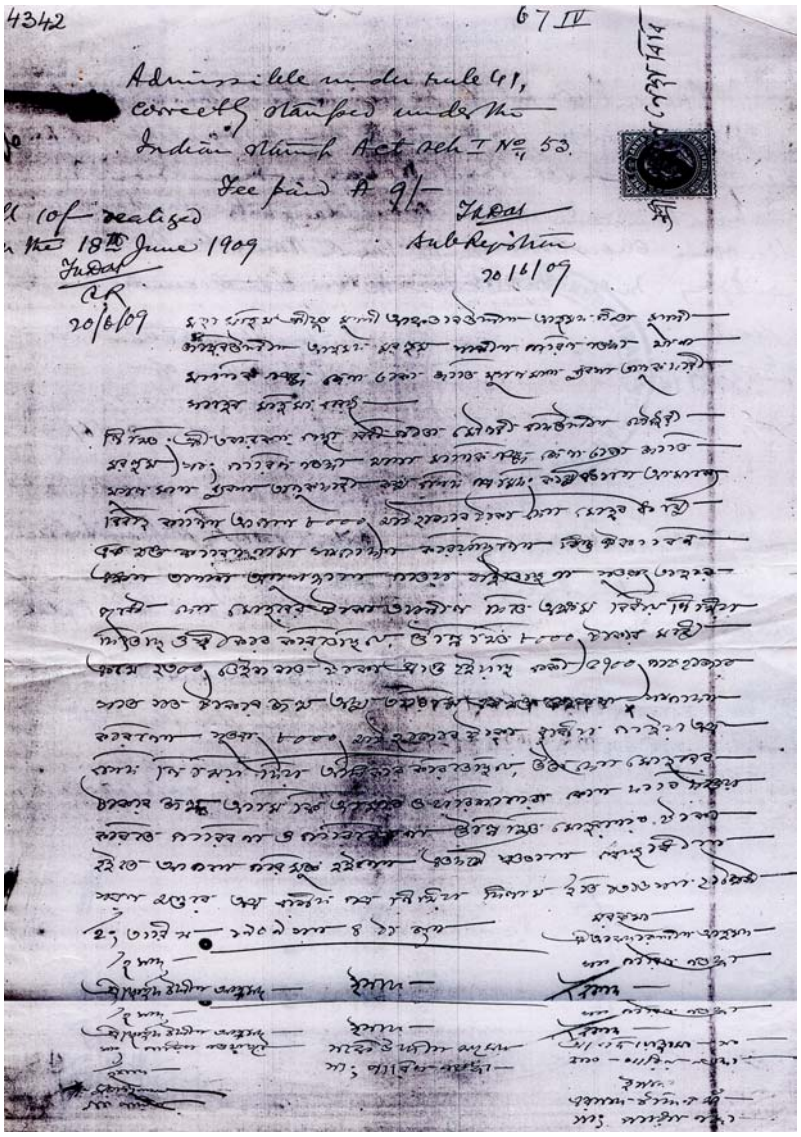

'দেনমোহর' পরিশোধের দলিল ১৯০৯
মোহাম্মদ আফতাবউদ্দিনের সঙ্গে তবাকরন্নেছা বিবির বিয়ে হয়েছিল ১৮৭৯।

তথ্যনির্দেশ

১. Redcliff Brown, 'Marriage', David L. Sills (সম্পাদিত), *International Encyclopedia of social sciences*, Vol. 10, The Macmilan, New York, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২, পৃ. ৭

২. মাহমুদা ইসলাম, *বিয়ে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯

৩. W.H.R Rives, 'Marriage', James Hasting (সম্পাদিত), *Encyclopedia of Region and Ethics*, Vol. viii, New York, ১৯৬৮, পৃ. ৪২৩

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহ প্রসঙ্গে*, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪

৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ষষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১০২

৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকা*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৮৮-৮৯

৭. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*, বাদশা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৭

৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *কোরানসূত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৪০৪

৯. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*, বাদশা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.৬৮

১০. Harow Noma & Ratan Lal Chakraborty (সম্পাদিত) *selected records on Agriculture, land revenue economy and society of Noakhali district.* ১৯৯০, পৃ. ২৩৮

১১. Hunter, WW, *Statistical account of Bengal*, Vol.VI, London, Trubner, ১৯৭৬, পৃ. ৩৮৬

১২. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৫

১৩. শওকত আরা হোসেন, দারিয়ানুর বেগম, *বিয়ে বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং মহিলা অধিকার*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯

১৪. মো. আবদুর রহিম, বাংলাদেশ মুসলিম বিবাহ নিবন্ধীকরণ বিবাহিতা নারীদের একটি মতামত জরিপ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৭৩, জুন ২০০২, পৃ. ৭৮।

১৫. শ্রীমতি তবাকারুন্নেসা বিবি, স্বামী আফতাব উদ্দিন পিতা মুন্সী জহিরউদ্দিন আহমদ, সাং- পারিল নওদ্ধা, থানা, মানিকগঞ্জ, জেলা- ঢাকা। বিয়ে করেছেন ১৮৭৯ সালে কিন্তু দেনমোহর প্রদানের দলিল, ১৯০৯- এর। ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিপারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৬. মনিরুজ্জামান, *ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী*, জীবনী গ্রন্থমালা ১১, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪২

১৭. স্ত্রী শ্রীমতি শায়েস্তা খাতুন বিবি, স্বামী মো. নূরুল ইসলাম্ ইবনে জুলফিকার আলী খান, মোহর ১৮০০ টাকা, ১৮৬৫

১৮. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

১৯. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

২০. নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা, ১৯১৪, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

২১. আফসারুন্নেছা খাতুনের সঙ্গে হোসনে উদ্দিন চৌধুরীর কাবিননামা, ১৮২৩, বলিয়াদি, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত।

২২. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর দলিলপত্রে রক্ষিত।

২৩. হাফিজউদ্দিন মৃধার সঙ্গে রাবিয়া খাতুন, ১৯০৭, ষোলঘর ভুই, ঢাকা।

২৪. নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা, ১৯১৪, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

২৫. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

২৬. সৈয়দা সুলতানা বানু, *পঁচাশি ও হযরত শাহআলী বেগদাদী (রা.) এর জীবনী*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০১, পৃ. ১২

২৭. জয়নাল হক সিকদারের সঙ্গে জহুরা খানমের কাবিননামা, ১৯৩৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

২৮. শ্রী শেখ বেহারীর সঙ্গে শ্রীমতি খাতুননেছা বিবির বিয়ের কাবিননামা, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

২৯. শ্রী শেখ আজগরের সঙ্গে শ্রীমতি ইন্দন বিবির বিয়ের কাবিননাম, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৩০. শ্রীমতি জয়নব বিবির সঙ্গে শ্রীযুক্ত সফির বিয়ের কাবিননামা, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৩১. সেবিকা আফসন বিবির সঙ্গে শেখ আবদুলের বিয়ের কাবিননামা, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৩২. একরারনামা, বরের পিতা শেখ মস্তাফা খান, পাত্রীর নাম শ্রীমতি এছা বিবি, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৩৩. শ্রীমতি নছিরন বিবির সঙ্গে শেখ ডিঙ্গার বিয়ের কাবিননামা, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৩৪. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৩৫. সৈয়দ ফারুজুল হকের সঙ্গে মোসাম্মদ হামিদা বানুর কাবিননামা, ১৯২৪, সিলেট, মজুমদার পরিবারের পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৩৬. নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা, ১৯১৪, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৩৭. হাফিজউদ্দিন মৃধা ও রাবিয়া খাতুন এর কাবিন নামা, ১৯০৭, ষোলঘর ভুই, ঢাকা।

৩৮. গোলাম মাওলার সঙ্গে আসাদুন্নেছা উম্মে জোহরা ফাতেমা খাতুন, ১৯১৩, মাদারীপুর।

৩৯. মৌলবী আবু সাইদ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে জিনাত মহল সাবিহা বেগমের কাবিননামা, ১৯৩৮, ফরিদপুর।

৪০. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪১. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮। মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪২. আজিজুল হকের সঙ্গে কেনিজ খাতুন, ১৯১৫, শান্তিপুর, নদীয়া, অধ্যাপক হোসনেয়ারার পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৩. সৈয়দ ফজলুল হকের সঙ্গে হামিদা বানু, ১৯২৪, সিলেট, মজুমদার পরিবারের পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৪. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৫. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৬. শ্রীমতি মোছাম্মদ আফসরন বিবি, শেখ সানরু, ১৮৭৯, আলিপুর

৪৭. নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা, ১৯১৪, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৮. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৪৯. শ্রীমতি ইন্দন বিবি, শেখ আজগর, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫০. শ্রীমতি বদিউন্নেছা, শেখ মোহন আলী সায়েদী, ১৮৭২, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫১. শ্রীমতি নুরজান বিবি, শ্রী শেখ আবদুল বারী, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫২. শেখ আবদুল আহাদ হক, শ্রীমতি ছদমন্নেছা বিবি, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫৩. শ্রীমতি এছাবিবি, শ্রী শেখ আবু মিয়া, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫৪. মৌলবী আবু সাইদ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে জিনাত মহল সাবিহা বেগমের কাবিননামা। ১৯৩৮, ফরিদপুর।

৫৫. সফীউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি ছয়লাবছা বিবির কাবিননামা, ১৮৭৯, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৫৬. নজিমউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে শ্রীমতি নওশা আক্তার খাতুনের কাবিননামা, ১৯১৪, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৫৭. সৈয়দ ফারুজুল হকের সঙ্গে মোসাম্মদ হামিদা বানু, ১৯২৪, সিলেট, মজুমদার পরিবারের পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৫৮. শ্রীমতি নুরজান বিবি, শ্রী শেখ আবদুর বারী, ১৮৭৯, আলিপুর পুলিশ কোর্টে রক্ষিত।

৫৯. আতাহার উদ্দিনের সঙ্গে শ্রীমতি আসমন্নেসা খাতুনের বিয়ের কাবিননামা, ১৯০৮, মানিকগঞ্জ, ড. নওয়াজেশ আহমদ-এর পারিবারিক দলিলপত্রে রক্ষিত।

৬০. Harow Noma & Ratan Lal Chakraborty (সংকলিত), *Selected records on Agriculture, land revenue, economy and society of Noakhali district,* ১৮৪৯-১৮৭৮, Japan International Cooperation Agency Dhaka, ১৯৯০, পৃ. ২৩৮।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, একত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা

আনিসুজ্জামান*

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তার ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাতের প্রতি বাঙালি মুসলমান সমাজের মনোভাব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের নানাধরনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাই। এর এক ভাগে দেখা যায় তাঁর সৃষ্টিশীলতার সপ্রশংস আস্বাদগ্রহণের প্রয়াস। আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, একরামউদ্দীন, কাজী আবদুল ওদুদের লেখায় তা ফুটে উঠেছে। আবদুল ওদুদের রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কে ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'আমার রচনা এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ করেছে বলে মনে পড়ে না।' অপরপক্ষে ১৯২৮ সালে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারলাভের প্রসঙ্গে লেখা হয় যে, 'পার্সী ও উর্দ্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেক কবি গীতাঞ্জলীর সাধ্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এবং মধুরতর রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।' তবে আলোচনা সবটা সাহিত্যবিচারে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা ও পৌত্তলিকতার অভিযোগ কেউ কেউ এনেছিলেন। মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খণ্ডন করেছিলেন, আর গোলাম মোস্তফা লিখেছিলেন যে, 'কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইসলামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। ... গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার ... ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে।' বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যকে উন্নত সাহিত্য বলে স্বীকার করেও ১৯৪৪ সালে, পাকিস্তান আন্দোলনকালে, আবুল মনসুর আহমদ বলেন যে, 'এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ সাহিত্যের কোনো দান নেই।' কারণ, 'এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের নয়।' রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের জন্যে কী করেছেন, সাধারণভাবে উত্থাপিত এমন প্রশ্নের উত্তরে কাজী আনোয়ারুল কাদীর পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'সূর্য মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষ কী করেছে?'

---

* এমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আক্রান্ত হন বামপন্থীদের দ্বারা। ১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে-অতিবাম রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, তার ঢেউ এসে লেগেছিল ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে। এই আদর্শের অনুসরণে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান ও আবদুল্লাহ আল-মুতী। সংঘের সভাপতি অজিতকুমার গুহ এ-বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন, কারান্তরালবাসী রণেশ দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গুপ্তও।

তবে বামপন্থী ভাবধারার তেমন প্রভাব তখন পূর্ব বাংলায় ছিল না, বরঞ্চ প্রভাব ছিল পাকিস্তানি ভাবধারার। তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৫০ সালে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছিলেন:

> নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে-সঙ্গে একথাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী।

এই আদর্শিক ঘোষণা কিন্তু রাষ্ট্রীয় বেতারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান বা নাটকের প্রচারে বাধা হয়ে দেখা দেয়নি, পাঠ্যপুস্তকে তিনি যথেষ্ট স্থানলাভ করেছিলেন এবং বেসরকারি পর্যায়ে তাঁর জয়ন্তী উদ্‌যাপনেও কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

সরকারি প্রতিকূলতা দেখা দেয় ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালনের সময়ে। সময়টা পাকিস্তানে সামরিক শাসনের। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারি বিরূপতার পোষকতায় দৈনিক *আজাদ* পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে, সম্পাদকীয় পাতায় ও অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতে থাকেন। তিনি হিন্দু ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা, সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু- যুবরাজের সম্মানে গান লিখেছিলেন; ইতিহাসাশ্রিত কবিতায় তিনি মুসলমান শাসকদের অবমাননাকারী, তাঁর রচনায় মুসলমান জীবন উপেক্ষিত, বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগে তিনি আপত্তিকারী; তাঁর লেখায় পৌত্তলিকতার ছড়াছড়ি, পাকিস্তানের মৌলিক ভাবধারার সঙ্গে তাঁর রচনা সাংঘর্ষিক। তাঁর জন্মশতবর্ষ-উদ্‌যাপনের প্রয়াস দুই বাংলাকে যুক্ত করার ষড়যন্ত্রবিশেষ, পাকিস্তানের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাতপ্রয়াসী এবং দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। *আজাদের* এসব বক্তব্যের জবাব প্রকাশ পায় দৈনিক *ইত্তেফাক* ও *সংবাদে।* তাতে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ মুসলিমবিরোধী নন, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী; তিনি হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম; সুফি মরমিবাদের প্রভাব ছিল তাঁর ওপরে, সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবতাবাদী; তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায়, তিনি নিজে এখানে দীর্ঘকাল বাস করেছেন এবং তাঁর রচনায় এই অঞ্চলের জীবন ও প্রকৃতি রূপলাভ করেছে; বস্তুত তাঁর সাহিত্যে মুসলমানেরা হীনভাবে চিত্রিত হয়নি; আমাদের

প্রাত্যহিক জীবনে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত, আমাদের অনুভূতি ও চেতনায় তিনি সর্বদা বিরাজমান।

এইসব তর্কবিতর্কের পটভূমিকায় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী বেশ বড়ো করেই উদ্‌যাপিত হয়- ঢাকায়, চট্টগ্রামে এবং প্রদেশের অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে তাতে যুক্ত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আবহমান ধারাকে নিজের বলে ধরে রাখার চেষ্টা, বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান ও স্বায়ত্তশাসনের স্পৃহা এবং তখনকার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণ। রবীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথ থাকেন না, হয়ে ওঠেন যেমন প্রেরণার উৎস, তেমনি সংগ্রামের বিষয়। ১৯৬১তে যদি রবীন্দ্রপ্রেমীদের জয় হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৬৫তে জয় হয় শাসককুলের। পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতীয় উৎসের সবকিছুর আমদানি নিষিদ্ধ হয়ে যায়- তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বইপত্র ও গানের রেকর্ডও পড়ে। পাঠ্যবই থেকে তিনি নির্বাসিত হন না, কিন্তু বেতার-টেলিভিশনে জায়গা হারান- ততদিনে দেশে টেলিভিশন চালু হয়ে গেছে। যুদ্ধশেষে প্রচার-মাধ্যমে যখন তিনি ধীরে ধীরে পুনর্বাসিত হন, তখনই, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় বেতার-টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার ক্রমে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন উনিশজন শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-বিজ্ঞানী। তাতে রবীন্দ্রনাথকে অভিহিত করা হয় 'বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে এবং সরকারি নীতির সমর্থনেও অনেকের বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তেমনি তার পালটা মতও প্রচারিত হয়। বিতর্ক এত প্রবল হয় যে, এক পর্যায়ে এ-নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তবে তাতে সভা বা অনুষ্ঠান করায় বাধা হয়নি। তাই দেখা গেল, সরকার-প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক প্রকাশ্যে সরকারি নীতির বিরোধিতা করছেন এবং সরকার-পৃষ্ঠপোষিত পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা মহাকবি স্মরণোৎসব করে মধুসূদন, গালিব, ইকবাল ও নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধানিবেদন করছেন, কিন্তু উৎসব শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। ফলে, রবীন্দ্র-সম্পর্কিত এই অনুষ্ঠানের খবর বা এই অনুষ্ঠানমালা নিয়ে আলোচনা সম্প্রচার করা যায়নি ঢাকা টেলিভিশনে। অন্যদিকে, ভারত থেকে বইপত্র আমদানি নিষিদ্ধ থাকায় গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। এই আবহাওয়ায় আবুল মনসুর আহমদও তাঁর পূর্বমত সংশোধন করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-সত্যেন দত্তকে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অংশ বলে স্বীকার করে নেন। অল্পকাল পরে, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে, 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে,

মুক্তিযুদ্ধের কালে তা মুখে মুখে গীত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে গানটির প্রথম দশ চরণ জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়।

তবে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নয় যে, বিষয়টার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটবে। কয়েক বছর আগে একজন রাজনীতিবিদ বলেন যে, যে-দেশে তিরিশ লাখ লোক স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেয়, সে-দেশে জাতীয় সংগীত রচনা করার মতো কি এমন একজনও নেই যে, কোথাকার কোন রবীন্দ্রনাথের গানকে আমাদের জাতীয় সংগীত করতে হয়! একজন সার্বক্ষণিক অধ্যাপক ও খণ্ডকালীন রাজনীতিবিদ দাবি করেন যে, ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে রচিত গান বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, সুতরাং আমাদের জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা হোক। এসব কথায় যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তাতে কিন্তু বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের আসনটি কেমন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া।

তবে বাংলাদেশ-আমলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কঠিনতম আঘাত আসে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে আহমদ শরীফের কাছ থেকে। পাকিস্তান-পর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সরকারি নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, লিখেছিলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকার অনুকূল হওয়ায় তিনি নিলেন রবীন্দ্র-বিরোধিতার দায়িত্ব। প্রথমে, ১৯৭৩ সালে, তিনি ঘোষণা করেন যে, রবীন্দ্রনাথ আর আমাদের অনুপ্রেরণার উৎসব হতে পারেন না। ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমীর *উত্তরাধিকার* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তিনি বহু অভিযোগ উত্থাপন করেন : রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকী কবি ও বিশ শতকী ভাবুক, তবে তাঁর রচনায় এমন কিছু নেই যা পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ছিল না; নোবেল পুরস্কার প্রাপকরূপে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতেই তিনি বিশ্বজনীন মানবিক চিন্তার কথা বলেছেন; তিনি উপনিষদের ভুল ব্যাখ্যাতা, পৌরাণিকতার মোহে আচ্ছন্ন, ব্রাহ্মমতের যথাযথ অনুধাবনে অপারগ - তিনি ব্রাহ্মদের হিন্দু আখ্যা দিয়েছেন এবং আস্থা স্থাপন করেছেন প্ল্যানচেটে; প্রাচীন পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত ও শিখ আখ্যান নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মুসলিম শাসক ও দরবেশ নিয়ে তিনি কিছু লেখেননি - তাতে মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট ছিলেন; অথচ ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ, গভীর আস্থা ও নিবিড় শ্রদ্ধা দেখা যায়; তাঁর গল্পে-উপন্যাসে গণমানবের স্থান হয়নি, তিনি তাদের কল্যাণকামী ছিলেন না; তাঁর মনের গভীরে ছিল সামন্তবাদের প্রতি মোহ অথচ উপনিবেশে তাঁর ঘৃণা ছিল না; তিনি জমিদারি উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, নিজেও ছিলেন নিপীড়ক জমিদার।

আহমদ শরীফের প্রবন্ধের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ করেন হায়াৎ মামুদ - *উত্তরাধিকার* পত্রিকার পরের সংখ্যায়। তার পরের সংখ্যায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লেখেন যে, আহমদ শরীফ ও হায়াৎ মামুদ দুই চরম অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তবে আহমদ শরীফ যে যাচাই-না-করা তথ্যের ওপর এতখানি নির্ভর করেছেন, তাতে তিনি বিস্মিত। সমাজতন্ত্রী বা সমাজসংস্কারক না হওয়ায় কিংবা ভারতে মুসলিম-শাসনের প্রসঙ্গ না-আনায় অথবা বিশ শতকী মনোভাব আয়ত্ত না করায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের কী ক্ষতি হয়েছে, আহমদ শরীফ তা দেখাননি। রবীন্দ্রনাথের আবেদন পাঠকের নান্দনিক বোধের কাছে, আর শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন তো চূড়ান্তভাবে এখনো মীমাংসিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ গণমানবের কল্যাণকামী ছিলেন না, একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।

এই পর্যায়ে সম্পাদক এ-বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করে দেন, কিন্তু আরো দীর্ঘকাল ধরে এ-নিয়ে অন্যত্র লেখালিখি চলে। তাতে অংশ নেন শওকত ওসমান, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান ও হুমায়ুন আজাদ। আহমদ শরীফের রচনাটিকে সৈয়দ শামসুল হক চিহ্নিত করেন 'রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ পঁচিশতম বার্ষিকীতে বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে কলঙ্কিত কাজ' বলে। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবর্ষে তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশে যে-আলোড়ন হয়েছে, তাতে হয়তো সৈয়দ হকের ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে থাকবে।

দুই

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাদেশে আমরা কেবল তর্কে মেতেছি, তাঁকে বোঝার বা ব্যাখ্যার চেষ্টা করিনি, এতক্ষণের আলোচনা থেকে এমন ভুল ধারণা যেন না হয়। পাকিস্তান-পর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বইপত্র বেরিয়েছিল অল্প। তার মধ্যে আ ন ম বজলুর রশীদের *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬১), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর *রবি-পরিক্রমা* (১৯৬৩), যোগেশচন্দ্র সিংহের *ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৪), আনোয়ার পাশার *রবীন্দ্র-ছোটগল্প-সমীক্ষা* (১৯৬৯) এবং সৈয়দ আকরম হোসেনের *রবীন্দ্রনাথের উপন্যান : দেশ কাল ও শিল্পরূপ* (১৯৬৯) - এসব বইয়ের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই ছিল হায়াৎ মামুদের *রবীন্দ্রনাথ : কিশোর জীবনী* (১৯৬৭)। এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তর প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং অন্যান্য রচনার সঙ্গে সেসব প্রবন্ধ অনেক লেখক নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা *সমকাল* অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। আমার সম্পাদনায় *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৮) নামে যে-সংকলনটি প্রকাশিত হয়, তাতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা থেকে শুরু করে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আহমদ ছফা পর্যন্ত পূর্ব বাংলার তিরিশজন প্রবীণ ও নবীন লেখকের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে দেখা যায় যে, প্রজন্মের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা থেকে ইহজাগতিকায় কেন্দ্রীভূত

হয়েছে; আমরা যেমন তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ও শিল্পকৌশলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছি, তেমনি কৌতূহলী হয়েছি তাঁর শিক্ষাভাবনা ও পল্লি-পুনর্গঠন প্রয়াসের বিষয়ে। বস্তুত শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দূর থেকে নৈবেদ্য না দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে সংগ্রামের সাথী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে পেতেই যে তরুণেরা বেশি উৎসাহী, তা তাদের নানাধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকেও বোঝা গেছে।

বাংলাদেশ-পর্বে রবীন্দ্রনাথের পক্ষসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা আর দেখা দেয়নি। তিনি যে কখনো সংকীর্ণতার বাঁধনে ধরা পড়েছেন, যা প্রচার করেছেন তা যে কখনো কখনো নিজে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এসব বিষয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আহমেদ হুমায়ুন, সফিউদ্দীন আহমদ ও আবদুশ শাকুর লিখেছেন। বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দেখিয়েছেন, কোথায় রবীন্দ্রনাথের শক্তি, কোথায় তাঁর দুর্বলতা। মার্কসবাদী রবীন্দ্রবীক্ষায় অবশ্য তাঁর পূর্বগামী রণেশ দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গুপ্ত। আবদুল মান্নান সৈয়দ মনোনিবেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের পাঠঘনিষ্ঠ আলোচনায় - সেখানে কবিতার আলোচনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রকাব্যবিচারে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা বিশিষ্ট, সেইসঙ্গে নাম করতে হয় মনজুরে মওলার। অ্যাকাডেমিক আলোচনায়ও নতুন মাত্রা এনেছেন অনেকে: যেমন, উপন্যাসের আলোচনায় সৈয়দ আকরম হোসেন, রাষ্ট্র ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনায় হুমায়ুন আজাদ, নাটকের আলোচনায় মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, গদ্যকবিতার প্রসঙ্গে সিদ্দিকা মাহমুদা, ছন্দের বিষয়ে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আবদুল মান্নান সৈয়দ, অলংকার সম্পর্কে আহমদ কবির, শিশুতোষ রচনা সম্পর্কে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। রবীন্দ্র-সংগীতের আলোচনায় সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, আনিসুর রহমান ও করুণাময় গোস্বামীর কাছে আমরা ঋণী। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনাবিষয়ে আবদুল্লাহ আল- মুতী, এ এম হারুন অর রশীদ, ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে হাসনাত আবদুল হাই, পল্লি-পুনর্গঠন ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আতিউর রহমান, সনৎকুমার সাহা ও গোলাম মুরশিদ, স্বদেশ রাষ্ট্র ও জাতীয়তা বিষয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবদুশ শাকুর ও গোলাম মুস্তাফা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্পর্কে সন্তোষ গুপ্ত, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও আবুল মনসুরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা সম্পর্কে মুহম্মদ আবুদল হাইয়ের মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসারী হয়েছেন কাজী দীন মুহম্মদ ও মনিরুজ্জামান। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনার অনুবাদ সম্পর্কে আবু রুশ্‌দ ও কবীর চৌধুরী অন্তর্দৃষ্টিমূলক সমালোচনা করেছেন। লোকসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শামসুজ্জামান খান, আলমগীর জলীল, আনোয়ারুল করীম ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন আহমেদুর রহমান, তবে এ-বিষয়ে ভুঁইয়া ইকবালের

বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গবাস এবং সেই সময়কার সৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন আহমদ রফিক, গোলাম মুরশিদ, আনোয়ারুল করিম ও মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, তার মধ্যে মাতৃভাষা, আর্ট ও সংগীত-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সুনির্বাচিত সংকলন যেমন উপভোগ্য, তেমনি পাঠযোগ্য রবীন্দ্রনাথের বিবিধ চিন্তা ও সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ-উপলক্ষে অনেক গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সন্‌জীদা খাতুন সম্পাদিত *সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ*, আবুল হাসনাত সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ : কালি ও কলমে*, ভীষ্মদের চৌধুরী-সম্পাদিত *প্রভাতসূর্য*, বিশ্বজিৎ ঘোষ-সম্পাদিত *তোমার সৃষ্টির* পথ উল্লেখযোগ্য। আমার সম্পাদনায় *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে* বেরিয়েছে ঢাকা থেকে আর *সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ : বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি* বেরিয়েছে বিশ্বভারতী থেকে। মনজুরে মওলার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের ১৫১টি গ্রন্থের প্রকাশ ঘটনা হিসেবে চমকপ্রদ।

এই আলোচনায় অনেক লেখক ও গ্রন্থের আলোচনা বাদ পড়ল, তা তাঁদের গুণের অভাবে নয়, আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতার জন্যে। সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বলতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-আবৃত্তি, গান গাওয়া ও নাটকের অভিনয়ও অন্তর্ভুক্ত হবে। স্বাধীনতালাভের পরে এসবের অনুশীলনে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, পুরোনো প্রতিষ্ঠানও নতুন গতিলাভ করেছে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে অনেক শিল্পী প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। প্রযুক্তির বিকাশও রবীন্দ্রনাথকে নিত্যসঙ্গী করতে আমাদের সাহায্য করেছে। তবু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান আমরা যত শুনি, সে-তুলনায় তাঁর রচনা পাঠ করি কম। আমার এই মনে-হওয়াটা ভুল হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো।

---

* প্রবন্ধটি ১৩ মে ২০১৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পঠিত।